১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন—
১৯৭১ সনের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার

এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

দিলআরা আক্তার

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ডঃ এম নজরুল ইসলাম

চেয়ারম্যান রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library

400427

400427

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-বাংলাদেশ
২০০১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উৎসর্গ

স্বামী

ইকবাল হায়দার চৌধুরী

400427

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ঃ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

400427

ঢাকা ঃ-

(দিলআরা আক্তার)
এম. ফিল. গবেষক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম, ফিল ডিগ্রীর জন্য দিলআরা আক্তার কর্তৃক রচিত **"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ঃ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ ইতিপূর্বে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হয়নি।

তারিখ ঃ-

(প্রফেসর ড. এম. নজরুল ইসলাম)
তত্ত্বাবধায়ক
ও
চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ সূচিপত্র ঃ-

১। সূচনা ঃ- ১২-১৫

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি। ১৫-১৭

২। পটভূমি ঃ-

২.১ ভাষা আন্দোলন (১৯৫২ইং)। ১৮-২৯

৩। স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গ ঃ-

৩.১ - ৫৪ সালের নির্বাচন। ৩০-৩২

৩.১ - যুক্তফ্রন্ট গঠন। ৩২-৩৩

৩.৩ - যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো। ৩৩-৩৫

৩.৪ - নির্বাচনের ফলাফল। ৩৬-৩৬

৩.৫ - যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও সরকারের পতন। ৩৬-৪২

৪। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান (১৯৫৬ইং) ঃ-

৪.১ - সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ। ৪৩-৪৫

৪.২ - স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গ। ৪৫-৫০

৫। পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অবসান ঃ- ৫১-৫৩

৫.১ - ১৯৬২ সনে পাকিস্তানের ২য় সংবিধানের আবির্ভাব ও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। ৫৩-৫৬

৫.২ - ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও স্বায়ত্ব শাসন আন্দোলন। ৫৬-৬০

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ - ১৯৬৯ - এর গনঅভ্যুত্থান ও আইয়ুব সরকারের পতন এবং পাকিস্তানে ২য় সামরিক শাসন জারি। ৬০-৬৭

৬। **১৯৭০ সনের নির্বাচন ঃ-**

৬.১ -নির্বাচনের পটভূমি ও আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। ৬৮-৭৪

৬.২ - ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানী সামরিক হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন। ৭৪-৭৭

৬.৩ - আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী ও পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা। ৭৭-৮২

৬.৪ - পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পন ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। ৮২-৯৩

৭। **উপসংহার ঃ-** ৯৪-৯৫

৮। **গ্রন্থপঞ্জী ও তথ্য সূত্র।** ৯৬-১১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ
(ABSTRACT)

/ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এ আন্দোলনের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীতে এ আন্দোলন চরম পরিণতি লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের আবেগ অনুভূতি প্রবলভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৫২-এর আত্মাহুতির চূড়ান্ত ও প্রত্যক্ষ সুফল বাঙালী অর্জন করেছিলো তার মুক্তিযুদ্ধে, বিজয়ে ও স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায়। বাঙালী জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের বিরাট অবদান ছিল। এটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন রুপে শুরু হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

১৯৫২ সালের আন্দোলন নিছক রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন ছিলনা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ক্রমাগতভাবে জনগন যেভাবে শোষিত ও নির্যাতিত হয়ে চলেছিলো তার বিরুদ্ধে অনেক খন্ড খন্ড অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ১৯৫২ সালের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো এবং ১৯৫২ সালের ব্যাপক গণ-আন্দোলন সেইসব পূর্ববর্তী আন্দোলনের সঙ্গে এক ধারাবাহিক যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিলো।

১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এ অঞ্চলের জনসাধারনের বড় অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণীর বাংলাভাষা সম্পর্কে একপেশে মনোভাবের ফলে বাঙালীরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ন হতে বাধ্য হন। দেশ বিভাগের পর বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উথাপন করে তমদ্দুন মজলিস। তমদ্দুন মজলিসের বিভিন্ন সেমিনারে মজলিস নেতারা, প্রখ্যাত বুদ্দিজীবী এবং শিক্ষাবিদগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অবশ্য তমদ্দুন মজলিসের অনেক আগে দেশ বিভাগের পূর্বে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে "উত্তর পশ্চিম" ও "পূর্বাঞ্চলে" দুটি স্বাধীন

Dhaka University Institutional Repository

সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্টার কথা চিন্তা করে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগন রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি আলোচনা করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের গোঁড়ার দিকে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও এ আন্দোলন মার্চের মধ্যেই ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন মূলত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ পর্যায়ে বাঙালীর দাবী ছিল প্রধানত বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯৫২ সালে আবার ভাষার জন্য বাঙালী ফুঁসে উঠল। এবারের আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল বা বরং সমগ্র জাতির মধ্যে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিলো। শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতি শোষণ ও বৈষম্যতা এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালীরা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করে।

বায়ান্ন পরবর্তীকালে যাঁরা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের বড় অংশই ভাষা সৈনিক ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের জাগরনের মধ্যে দিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ - ৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্যাতন, ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মত রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন বাঙালী জাতি করেছে ভাষা আন্দোলন থেকে তার প্রেরণা এসেছে। এ আন্দোলনের পর থেকে বাঙালী জাতি ধাপে-ধাপে সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। ১৯৭১ সালে অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভাষা আন্দোলন অপরিসীম সাহস ও প্রেরনার উৎস।

আলোচ্য গবেষনায় **"১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার"** এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সূচনা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণা পদ্ধতির পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাংলা ভাষার প্রশ্নটি কিভাবে পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন রূপে পরিণত হয়েছিলো তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। একটি গবেষণা কর্ম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য কি ধরনের গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় তা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেগুলো তখনকার সময় যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলো।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো, নির্বাচনের ফলাফল, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও সরকারের পতন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব রেখেছিলো এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রনয়ন সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকেই প্রয়োজন দেখা দেয় একটি সংবিধান প্রনয়নের। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের আশা আখাংকার কোন পূর্ণ প্রতিফলনই ঘটেনি। যদিও লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেন। তবুও ১৯৫৬ সালের সংবিধান পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিতে ব্যর্থ হয় এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অবসান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় সংবিধানের আবির্ভাব ও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, আইয়ুব সরকারের পতন ও পাকিস্তানে দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারি এ সকল প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৬৯ সনের গণ-অভ্যুত্থান বাঙালী জাতির মুক্তির ও স্বাধীনতা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

ষষ্ট অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন, ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানীদের উপর পাকিস্তানী সামরিক হস্তক্ষেপ ও নির্যাতন, শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী, পূর্ব-পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও আলোচিত হয়েছে কিভাবে রক্তক্ষয়ী

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় সমগ্র আলোচনার উপসংহার। এতে উপস্থাপিত তথ্য সমূহের সার্বিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালী জাতি নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধজাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তাদের আত্মদান আজ আন্তর্জাতিকভাবে কতটুকু স্বীকৃতি লাভ করেছে এ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি তা হলো এ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা। বাংলা একাডেমী বা লাইব্রেরীতে যে সকল গ্রন্থ এ সম্পর্কে সংগ্রহ করেছি সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর পাতা ছেঁড়া। তারপরও যথাসম্ভব যে গ্রন্থসমূহ সূধীজনের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যেগুলি সঠিক তথ্য ও তত্ত্বের দিক নির্দেশ দিয়েছে আমি সে সব মূল্যবান গ্রন্থ থেকে সহায়তা গ্রহন করেছি।

এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে নানাভাবে ঋণী, প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উৎস হিসেবে যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ধানমন্ডি, ঢাকা। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গ্রন্থাগার। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি, উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগীতার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

এম. ফিল. এর কোর্স সমাপ্ত করতে প্রথম থেকেই যাঁর ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগীতা আমাকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তিনি আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক এম নজরুল ইসলাম। এ গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধান করার কঠিন দ্বায়িত্ব গ্রহন করে তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন। প্রধানত তাঁর মত একজন সুদক্ষ, অভিজ্ঞ, আন্তরিক ও যত্নশীল তত্ত্বাবধায়কের জন্যই আমি প্রথম থেকে গভীর আগ্রহ নিয়ে এই কাজ সমাপ্ত করার শক্তি পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋন অপরিমেয় ও অপরিশোধযোগ্য। তদুপরি তাঁর সহধর্মিনী মিসেস ফিরোজা ইসলাম এ গবেষণার ব্যাপারে আমাকে যে স্নেহার্দ্র অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, ফিল প্রথম পর্বের চারটি বিষয়ের উপর আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া ক্লাশ নিয়েছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ম, সাইফুল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী ও তালুকদার মনিরুজ্জামান। এ তিনজন অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান এবং সুদক্ষ শিক্ষকের সস্নেহ সহায়তার জন্যই টেক্সটসমূহের কঠিন অধ্যায়গুলো অত্যন্ত সহজে আমার কাছে বোধগম্য হয়েছে। তাঁদের কাছে আমি ঋণী।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ড. আমিনুর রহমান, অধ্যাপিকা নাজমা চৌধুরী, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান, ড. ডালেম চন্দ্র বর্মনসহ সকল শিক্ষকের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা সকলেই আমাকে অকৃত্রিম স্নেহে উৎসাহিত করেছেন এবং তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে সহায়তা করেছেন।

এছাড়াও আমি যাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সু-পরামর্শ এবং সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের সবার নাম এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব হল না। তারপরও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহপাঠিবৃন্দ এবং স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রেরনার কথাও স্মরন করছি।

আমার স্বামী ইকবাল হায়দার চৌধুরীর, আমার মা, ভাই বদিউল আলম চৌধুরী ও দেবর আশ্রাফ উদ্দিন হায়দার চৌধুরীর ত্যাগ ও অনুপ্রেরণার ঋণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে শেষ করা যাবে না।

অভিসন্দর্ভটি অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে কম্পিউটার কম্পোজ ও সংশোধন করে দেয়ার জন্য ফজলে এলাহী-এর কাছে কৃতজ্ঞ। সবশেষে যাঁরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাকে এই গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে সহযোগীতা করেছেন কিন্তু নাম উল্লেখ করতে পারিনি তাঁদের সকলের প্রতি সকৃতজ্ঞ ঋন স্বীকার করছি।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দিলআরা আক্তার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. সূচনা ঃ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক অনন্য চেতনাদীপ্ত অধ্যায়। জাতির এগিয়ে চলার জন্য এ আন্দোলন প্রতিবাদী চেতনার এমন এক সুবিস্তৃত পথ রচনা করেছে যা জাতিকে যে কোন সংকটকালে পথের দিশা দিবে। অন্যায়ের বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করার, অধিকার হরনের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার প্রেরণা দেয় এ আন্দোলন এ আন্দোলনের তুমুল লেলিহান শিখায় গ্রাস করে নিয়েছিল এ দেশ ও জাতিকে ১৯৭১ সালে। তাই বলে ভাষা আন্দোলনকে ১৯৫২ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক হবে না। এ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৪৭ সন থেকে। এমনকি দেশ বিভাগের পূর্বেও সচেতন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদগণ বাংলাভাষা প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উচ্চারন করেছেন।[১] দেশ বিভাগের পর বাংলাকে তৎকালীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উথাপন করেন তমদ্দুন মজলিস।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। যদিও এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, এ অঞ্চলের মানুষের বড় অংশ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু পশ্চিমা শাসকগোষ্টির বাংলা ভাষা সম্পর্কে একপেশে মনোভাবের ফলে বাঙালীরা তাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন।

১৯৪৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম ও অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে "পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস" নামে এ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠে।

তমদ্দুন মজলিসের বিভিন্ন সেমিনারে মজলিস নেতারা, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।[২] প্রথমদিকে এর কর্ম তৎপরতার পরিসর ছিল খুবই সীমিত। যে সব আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হত তাতে স্বতস্ফূর্ত সাড়া মিলত না। অবশ্য তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠার কয়েক মাস আগে

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটি প্রবন্ধে বলেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহন না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহন করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।"[৩] শুধু সাংস্কৃতিক মহলই নয়, রাজনৈতিক মহলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ভাষা বিষয়ক কিছু উল্লেখযোগ্য চিন্তা-ভাবনা ছিল। ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তদানীন্তন সাধারন সম্পাদক আবুল হাসিম প্রাদেশিক কাউন্সিলের সামনে পেশ করার জন্য যে খসড়া ম্যানিফেস্টো প্রণয়ন করে ছিলেন তাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৪] ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে ঢাকায়, "গণ আজাদী লীগ" নামে একটি রাজনৈতিক গ্রুপ গঠিত হয়।[৫]

"গণ আজাদী লীগ" গ্রুপটি গঠিত হয়, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, তাজুদ্দিন আহমদ, অলি আহাদ প্রমূখ নেতৃস্থানীয় কর্মীর দ্বারা। ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের যুব কর্মী সম্মেলন নামে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হলেও এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়।[৬]

পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু"-এর নামে তমদ্দুন মজলিস একটি বই প্রকাশ করে।[৭] এ পুস্তিকা জনমত গঠনে সুদূর প্রসারী অবদান রাখে। রাষ্ট্র ভাষা দাবী সম্বলিত এটাই ছিল প্রথম পুস্তিকা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হয়। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ স্বাক্ষরতা অভিযানে বেশ সাড়া পাওয়া যায়। এমন কি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এ মেমোরেন্ডামে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে তৎকালীন ডিআইজি মরহুম আবুল হাসনাতের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময় কয়েকজন মন্ত্রীও গোপনে এ দাবীকে সমর্থন করেন। সে সব মন্ত্রীর মধ্যে হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও সৈয়দ মুহাম্মদ আফজালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮] ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে জনপ্রিয় করার জন্য তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষার দাবীকে অগ্রাহ্য করার ফলে ঢাকায় তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজধানীতে ছাত্র ধর্মঘট ও রমনায় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও এ আন্দোলন মার্চের মধ্যেই ঢাকার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন মূলত শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ পর্যায়ে বাঙালীর দাবী ছিল প্রধানত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু ১৯৫২ সালে আবার ভাষার জন্য বাঙালী ফুঁসে উঠল। আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণীতে নয়, বরং সমগ্র বাঙালী জাতির মধ্যে প্রভাব ফেলে। শুধু ভাষার বৈষম্য নয়, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতি শোষণ ও বৈষম্যতা এ পর্যায়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।[১০] ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্র ভাষার দাবী নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয় ৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারীতে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। বস্তুত ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন ঘটনায় বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ চেতনার বিকাশ ঘটে। ফলে নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়। এ নেতৃত্ব পরবর্তীকালে রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে বাঙালীরা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করে।

বায়ান্ন পরবর্তীকালের যাঁরা জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের বড় অংশই ভাষা সৈনিক ছিলেন। এ কারনে ভাষা আন্দোলনকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম সুসংহত স্ফুরণ বলা যায়।[১১] ভাষা আন্দোলনের জাগরনের মধ্যে দিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, যুক্তফ্রন্ট গঠন, ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ এর গণ অর্ভূথান, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মত রক্তক্ষয়ী আন্দোলন সংঘটিত হয়। এ পর্যন্ত যতগুলো আন্দোলন বাঙালী জাতি করেছে ভাষা আন্দোলন থেকে তার প্রেরণা এসেছে।

ভাষা আন্দোলন বাঙালী জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছিল। এ আন্দোলন সাস্কৃতিক আন্দোলন রূপে শুরু হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এ আন্দোলনের পর থেকে বাঙালী জাতি ধাপে-ধাপে সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। এটিও অবশ্য ঠিক যে, ১৯৪৮ সালে সূচিত ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে পরিণতি লাভ করলেও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানের দাবী বাঙালীরা বৃটিশ আমল থেকেই করে এসেছিলো। ১৯৭১ সালে অগনিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভাষা আন্দোলন ছিল অপরিসীম সাহস ও প্রেরণার উৎস। এ আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ প্রদর্শক, পরিশেষে বলা যায় ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন ১৯৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকাগার।

১.১. গবেষণার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও গবেষণা পদ্ধতি ঃ-

একটি গবেষণা কিভাবে পরিচালিত হবে এ ব্যাপারে কতিপয় প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়ে ঐক্যমত বিদ্যামান। স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ পদ্ধতি অনুসরন করে গবেষণা শুরু করতে হয় এবং কতিপয় সুনির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রমের মধ্যে দিয়ে তা শেষ করতে হয়। কোনো গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারন করা হচ্ছে গবেষণার প্রাথমিক অথচ মৌলিক কাজ। এ পর্যায়ে যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হবে, সে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। বিষয়টির বর্ণনায় ঐতিহাসিক বিকাশের প্রসঙ্গ থাকা শ্রেয়।[১২] এর ফলে বিষয়টির বর্তমান ধারণা পেতে সুবিধা হয়। সর্বোপরি নির্ধারিত বিষয়টির কোন কোন দিক নিয়ে গবেষণা করা হবে, তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

১.১. উদ্দেশ্য ঃ-

গবেষণার উদ্দেশ্য কি তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গবেষক কি উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য গবেষণা করছেন, সুনির্দ্দিষ্টভাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। যদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে তা অর্জন করা কঠিন। তবে একটি গবেষণার একটি মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে বা একাধিক উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। উদ্দেশ্যের সংখ্যা যতোই হোক না কেন, সেগুলোকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আবার কোন গবেষণায় প্রধান উদ্দেশ্য ও অপ্রধান উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় ধরনের উদ্দেশ্য গুরুত্বের ক্রম অনুসারে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রধান উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

আরোপ করা উচিত। কাজেই গবেষণার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তা সুনির্দ্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে পরবর্তী পর্যায়গুলো থেকে তা অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।[১৩]

১.২ গুরুত্ব ঃ-

প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই গবেষণার গুরুত্বর দিকটি বিবেচনা করা হয়। কারন মানুষের সময় ও শ্রমের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করাই মানুষের কাম্য। কাজেই এমন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা উচিত নয় যার সামাজিক ও তাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই।[১৪] যেমন- আরব সাগরে কত ফোঁটা পানি আছে এ বিষয়টি সম্পর্কে জানার কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই। কাজেই এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। গবেষককে অবশ্যই যুক্তি সহকারে তার গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হবে।

১.৩ পদ্ধতি ঃ-

গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য এটা বাস্তবায়নের জন্য যে সব তথ্যের প্রয়োজন এগুলো দু'ধরনের উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। (১) প্রাথমিক উৎস, (২) মাধ্যমিক উৎস। এক্ষেত্রে আমি মাধ্যমিক পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছি। গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা, ইত্যাদির সাথে পরিচিতি লাভের চেষ্টা করছি। কেননা পুস্তক পর্যালোচনা থেকে নির্ধারিত গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা কিছু পাওয়া যাবে তা গবেষনার জন্য সহায়ক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। মোস্তফা কামাল ঃ- ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, প্রকাশনা- মোঃ আবদুল ওয়াদুদ। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ জুবলী রোড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। পৃষ্ঠা-১

২। বিশেষ সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ডাইজেস্ট মার্চ ১৯৭৮

৩। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ "আমাদের ভাষা সমস্যা" দৈনিক আজাদ ১২ শ্রাবন ১৩৫৪

৪। *Abul Hashim, Draft Marifesto of the Bengal provincial Muslim League,* প্রকাশক সামসুদ্দিন আহমেদ ১৫০, মোগলটুলি, ঢাকা।

৫। আশুদাবী কর্মসূচি আদর্শ, প্রকাশক কামরুদ্দিন আহাম্মদ, কনভেনার গণ আজাদী পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, জুমরাইল লেন, ঢাকা জুলাই ১৯৪৭

৬। বদরুদ্দীন ওমর, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাক্তন সহযোগী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা-৪২৯

৭। আবুল কাশেম, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস।

৮। *I bid pg-12* (মোস্তফা কামাল সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন)

৯। *Op. cit pg-13* (মোস্তফাকামাল সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন)

১০। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত, ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস। ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১১। *I bid*

১২। *James Black and Dean champion, Methods and issues in social Research, John willey and sons, Inc, 1976, p.p.* ১০৫-১০৬

১৩। মোঃ আবদুল মান্নান - তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষণ পদ্ধতি। কয়তোয়া পাবলিকেশন্স, ঢাকা-জুলাই ১৯৯৬ই *p.p.*-২১৭-২১৮

১৪। *I bid p.* ২১৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. পটভূমি ঃ

২.১ ঃ - ভাষা আন্দোলন (১৯৫২ সন)

বৃটিশ-ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেসব আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল অত্যন্ত তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক আগে থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উথাপিত হয়।[১] দেশ বিভাগের পূর্বে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করে সচেতন বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগন রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি আলোচনা করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে লাহোর প্রস্ত াব সংশোধন করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটির তাৎপর্য কমে যায়নি।[২]

(ক) ভাষা আন্দোলনের কারন ঃ-

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের পক্ষ হতে "হিন্দী"কে যখন সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার জোর প্রচেষ্টা চলছিল, তখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা দাবী হিসেবে ভারতের উর্দু সমর্থক মুসলমানদের পক্ষ হতে "উর্দু"কে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উথাপিত হয়। হিন্দী ও উর্দুর রাষ্ট্রভাষার আসন দখল করার এ তুমুল লড়াইয়ের প্রতিকূল পরিবেশে আমাদের সচেতন বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক, শিক্ষাবিদগন সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলার দাবীকে সোচ্চার করে তুলে ধরেছিলেন।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন, হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর যুক্তিসঙ্গত কারনে উর্দুকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা

Dhaka University Institutional Repository

উচিত। ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদের বক্তব্য খন্ডন করে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ ১৯৪৭ এর ২৯শে জুলাই দৈনিক আজাদে প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরনে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট ভাষা রূপে গন্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। ..... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহন না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।"[৩]

পূর্ববঙ্গ তথা স্বাধীন মুসলিম প্রধান পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার যোগ্য নিরূপন ও দাবীর যৌক্তিকতা বিচার অতঃপর বুদ্ধিজীবী মহলে চলতেই থাকলো। ১৯৪৭ সালের জুন মাসের শেষ দিকে ঢাকায় তৈরী হলো আদর্শ ভিত্তিক একটি ক্ষুদ্র সংগঠন "গণ আজাদী লীগ"।[৪] এ দলের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন "কমরুদ্দিন আহমেদ" এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন বামপন্থী নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি "গণ আজাদী লীগ" এ মেনিফেস্টোতেই স্পষ্টভাবে জনসাধারণকে জানিয়েছিল যে, "বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যথোপযোগী করবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা হবে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[৫]

বাঙালীরা আশা করেছিল যে, বৃটিশ শাসনের অবসানে তাদের মৌলিক চাহিদা বা আখাংকাগুলো পূরণ হবে। নবজাগ্রত শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্তরা তখন মৌলিক চাহিদাগুলো পূরনের পাশাপাশি এক উজ্জ্বল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনের স্বপ্নে বিভোর ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পাঞ্জাবী আমলা সেনাচক্রের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার বাঙালী জাতির উপর অত্যাচার, নির্যাতন, শোষন, নিপীড়ন চালাতে শুরু করে। অফিস-আদালতে ইংরেজী ও উর্দু ভাষা ব্যবহারের উদ্যোগ গৃহীত হয়। পোস্টকার্ড ইত্যাদির মত ছোট খাটো জিনিষেও উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবে সরকার বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে ভাষা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলন ঃ-

১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম ও কয়েকজন অধ্যাপক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে "তমদ্দুন মজলিস" নামে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। এ তমদ্দুন মজলিসই রাষ্ট্র ভাষা বাংলা করার দাবীকে উত্থাপন করে ভাষা আন্দোলনের গোড়া পত্তন করে। এ মজলিসের বিভিন্ন সেমিনারে নেতারা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদগন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৬] প্রথমদিকে এর কর্মতৎপরতার পরিসর ছিল খুবই সীমিত। যে সব আলোচনা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হত তাতে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলত না। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু"- এ নামে তমদ্দুন মজলিস একটি বই প্রকাশ করে।[৭] এ পুস্তিকা জনমত গঠনে সুদূর প্রসারী অবদান রাখে। রাষ্ট্র ভাষা দাবী সম্বলিত এটাই ছিল প্রথম পুস্তিকা।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে এক স্বাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হয়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ অভিযানে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এমনকি অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাও এ মেমোরেন্ডামে স্বাক্ষর করেন। এঁদের মধ্যে তৎকালীন ডিআইজি মরহুম আবুল হাসনাতের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময় কয়েকজন মন্ত্রীও গোপনে এ দাবীকে সমর্থন করেন। এঁদের মধ্যে হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী ও সৈয়দ মোঃ আফজালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৮] ছাত্রদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষার বাংলার দাবীকে জনপ্রিয় করার জন্য তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে ফজলুল হক হলে সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। এ সভার আলোচনায় অংশ নেন কবি জসিম উদ্দিন, কাজী মোতাহর হোসেন, অধ্যাপক আবুল কাশেম ও কয়েকজন মন্ত্রী।[৯]

(গ) প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ও ভাষা আন্দোলন ঃ-

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীকে আরো সোচ্চার করার জন্য ফজলুল হক হলের সাহিত্য সভার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নুরুল হক

Dhaka University Institutional Repository

ভুঁইয়াকে আহবায়ক নির্বাচিত করে প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। প্রথম দিকে খুবই গোপনীয়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়। কারন তখনও ভাষা প্রশ্নে জনমত গড়ে উঠেনি। "এ সময় রাষ্ট্র ভাষা বাংলার স্বপক্ষে ইশতেহার বিলি করতে গিয়ে ছাত্ররা চকবাজারে স্থানীয় জনতা কর্তৃক ঘেরাও হয়।"[১০] পরে অবশ্য রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে কি কি উপকার হবে এ নিয়ে বক্তৃতা দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ পরিষদের কর্মতৎপরতায় এ সময় রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নটি ছাত্রমহলে সামগ্রিকভাবে জনপ্রিয় দাবীতে পরিণত হতে শুরু করে। উর্দুর স্বপক্ষে ক্ষমতাসীন মহলের গৃহীত এ সময়ের কিছু পদক্ষেপ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শিক্ষক বুদ্ধিজীবী ও সচেতন শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এ সময় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীর স্বপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিকট একটি মেমোরেন্ডাম পেশ করা হয়। কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনৈতিক, আইনজীবী, আলেম-ওলামা, ডাক্তার, ছাত্রনেতাসহ প্রায় সকল শ্রেণীর লোক এ স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের বাংলা ভাষাভাষী মন্ত্রীরাও এ স্মারকলিপিতে সমর্থন দেন। ৭ই মার্চ ফজলুল হক হলে এ সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ই মার্চ ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘট ও প্রদেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১১ই মার্চের কর্মসূচী সার্বিকভাবে সফল হয়। ঢাকার রাজপথ ছাত্রজনতার রাষ্ট্র ভাষার দাবীর শ্লোগানে মুখরিত হয়। এতে অনেক ছাত্র আহত হয় এবং অনেক ছাত্র গ্রেফতার হয়। ১১ই মার্চের আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্র ভাষার দাবী নতুন গতি লাভ করে। ইতিমধ্যে সংগ্রাম পরিষদে বিভিন্ন গ্রুপ ও বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধি নিয়ে একে আরও সম্প্রসারিত করা হয়। এতে এ পরিষদ আন্দোলনকে সক্রিয় করতে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।

(ঘ) শিক্ষা সম্মেলন ও ভাষা আন্দোলন ঃ-

১৯৪৭-এর ৫ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের সংবাদ যখন প্রকাশ পায়, তখন উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হতে যাচ্ছে এ আশংকায় ছাত্র,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ও সমাজের সচেতন শ্রেণী এ সময় খুবই তৎপর হয়ে উঠে। ৪৭-এর ১৭ই নভেম্বর বাংলা ভাষাকে পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার অনুরোধ জানিয়ে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি স্মারক পত্র দাখিল করা হয়। পূর্বপাকিস্তানের শত শত নাগরিক এ স্মারক পত্রে স্বাক্ষর করেন। স্মারক পত্রে উল্লেখিত প্রস্তাবটি পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী মন্ত্রীরাও সমর্থন করেন বলে জানা যায়।[১১] শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে এ সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার পর পরই সে দিনেই ঢাকা জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা দলে দলে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলতলায় এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এটাই ছিল প্রথম ছাত্রসভা। সভার পর প্রতিবাদ মিছিল করে ছাত্ররা যান সেক্রেটারিয়েটে। সেখানে কৃষিমন্ত্রী তাদের দাবী মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। তারপর ছাত্ররা নুরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জানান। নুরুল আমীন ওয়াদা করেন যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে ব্যর্থ হলে তিনি আর মন্ত্রী থাকবেন না। অবশেষে মিছিলটি খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে যায় এবং নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে কয়েকজন সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। কিছু বিতর্কের পর নাজিমুদ্দিন লিখিতভাবে আশ্বাস দেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন।[১২]

১৯৪৭ সালে ৭ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে, "পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সমস্যা" সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য ঢাকার শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মাওলানা আকরাম খাঁ। ভাষনে তিনি ঘোষণা করেন "উর্দু কিছুতেই বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইতে পারেনা। তিনি আরো বলেন, শতকরা নিরানব্বই জন যে ভাষায় কথা বলে, সেই ভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষা চাপাইয়া দিবার কোন প্রশ্নই উঠেনা।"[১৩]

এ সময় ঢাকায় বাংলা ও অবাঙালী উর্দু সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নটি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ১২ই ডিসেম্বর সংঘর্ষের ফলে ২০জন আহত ও ২জন মারা যায়। প্রতিবাদে ১৩ই ডিসেম্বর ছাত্র ও সেক্রেটারিয়েট কর্মচারীরা ধর্মঘট করে। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য ঢাকা শহরে ১৫ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি হয়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) গণপরিষদের অধিবেশন ও ধীরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদ ঃ-

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশন। এ অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা প্রশ্নে সরকারী প্রস্তাবের উপর একটি সংশোধনী পেশ করেন। সংশোধনী আনতে গিয়ে তিনি বলেন, "..... রাষ্ট্রভাষা সেই ভাষারই হওয়া উচিত, রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষের যে ভাষা ব্যবহার করে এবং ..... আমি মনে করি যে, বাংলাভাষাই আমাদের রাষ্ট্রের লিংগুয়া ফ্রাংকা ..... যদি ২৯নং বিধিতে ইংরেজী ভাষা সম্মানজনক স্থান পেতে পারে ..... তাহলে বাংলা বা চার কোটি চল্লিশ লক্ষ লোকের ভাষা কেন সম্মানজনক স্থান পাবে না? কাজেই এ ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। এ ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা রূপে বিবেচনা করা উচিত। সুতরাং ..... আমি প্রস্তাব করি যে ২৯নং বিধিতে ইংরেজী শব্দটির পরে অথবা "বাংলা" শব্দটি যোগ করা হোক।"[১৫]

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি সরকারী সদস্যদের বিরোধীতার মুখে অগ্রাহ্য হয়। ১৮৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির উনত্রিশ নং উপধারা সংশোধনের জন্য "ইংরেজী" ভাষার সঙ্গে উর্দু ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারী প্রস্তাবের উপর ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উপরোক্ত সংশোধনী আনেন।

(চ) আন্দোলনের উত্তাল সূচনা ঃ-

করাচীতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষার দাবীকে অগ্রাহ্য করা হলে ঢাকা তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। রাজধানীতে ছাত্র ধর্মঘট ও রমনা এলাকায় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ফেব্রুয়ারীতে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"[১৬] রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ সময় তমদ্দুন মজলিস ও সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রে এক যৌথ বিবৃতি দেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশের জন্য বিবৃতিটি দেয়া হয়েছিল। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া, অধ্যাপক এম, এ, কাশেম, অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম,

Dhaka University Institutional Repository

আজিজ আহমদ, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী, অলি আহাদসহ আরো অনেকে। বিবৃতিতে বলা হয় যে, মাতৃভাষাকে কোনঠাসা করার জন্য যে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলতেছে তার বিরুদ্ধে তৎপর হওয়া অবশ্যই কর্তব্য। দূর্ভাগ্যের বিষয় সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজ এ ব্যাপারে এখনও সম্যক অবহিত বলে মনে হয় না। সবার মনে রাখা উচিত দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া মাতৃভাষা যথাযোগ্য মর্যাদার স্থান পাবে না।[১৭]

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রয়োজনে "প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" সম্প্রসারন ও পূর্নগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কমরুদ্দিনের সভাপতিত্বে একটি নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। নতুন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদে গন আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি, এছাড়া "ইনসাফ" "জিন্দেগী" ও "দেশের দাবী" পত্রিকার পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর সম্প্রসারিত রূপ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে ফজলুল হক হলের সভায় ৭ই মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট ও ১১ই মার্চ দেশের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১৮]

(ছ) তরঙ্গায়িত ১৯৪৮ ঃ-

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ৪৮ সালের ১১ই মার্চের আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। সত্যি বলতে কি ১১ই মার্চ আন্দোলন না হলে ৫২-এর আন্দোলন হতোনা। ৪৮-এর ১১ই মার্চ রাষ্ট্র ভাষার দাবী নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়, ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে তা পূর্ণতা পায়।"[১৯] বস্তুতঃ ৪৮-এর ১১ই মার্চ ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম সংঘটিত গণবিক্ষোভ।[২০]

"এ আন্দোলন তৎকালীন সরকারকে রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। অথচ রক্ত দিয়েও ৫২ সালে সরকারকে টলানো যায় নি। ভাষার দাবী উঠাবার নৈতিক বল যতটুকু এসেছিল তা ১১ই মার্চের চুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। কারন চুক্তি লংঘিত হয়েছিল বলেই ৫২ সালের আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ১১ই মার্চ চুক্তি সম্পাদিত না হলে চুক্তি লংঘনের প্রশ্ন আসতো না। ৫২ সালের আন্দোলন মূলত ২১, ২২,

Dhaka University Institutional Repository

২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এরপর পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার এটাকে তছনছ করে দেয়। আজো ভাববার বিষয় ভাষার দাবী কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"[২১]

(জ) জিন্নাহর আগমন এবং আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায় ঃ-

১৯৪৮ সনের ১৯শে মার্চ বিকেলে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা আগমন করেন। এসেই তিনি ২১শে মার্চ বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন। উক্ত জনসভায় তিনি একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা একথা ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণা জনমনে দারুন হতাশা সৃষ্টি করে। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন, "*Urdu and only urdu, shall be the state language of pakistan.*"[২২] তাঁর এ দম্ভপূর্ণ ঘোষণার প্রতিবাদ করা হয় তাৎক্ষনিকভাবে। সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছাত্ররা "না, না" ধ্বনি দিয়ে উঠেন এবং সভাস্থল ত্যাগ করেন। এর ফলে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উত্থিত হয় এবং আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়। সে সময়ে শক্তিশালী ভাষা আন্দোলনের চাপে পড়ে স্বয়ং নাজিমুদ্দীন সাহেব ওয়াদা করেছিলেন যে, বাংলা যাতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য হয়, তারই ব্যবস্থা তিনি করবেন। কিন্তু নাজিমুদ্দীন সাহেব সে ওয়াদা খেলাপ করায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আবার শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের আন্দোলন হতেও এবারের আন্দোলন অনেক বেশী শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল লীগ সরকারের স্বরূপ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী জনসাধারনের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ে।

(ঝ) ৫২'র অনিবার্য পরিণতি ঃ-

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" এই ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্র জনতা কর্তৃক ৩০শে জানুয়ারী ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ,

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রলীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে একটি "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠিত হয়। এই সভায় স্থির হয় যে, ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদেশ ব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। আসন্ন ২১শে ফেব্রুয়ারী দিবসের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ঠা ফেব্রুয়ারী "হরতাল" ঘোষিত হয় এবং তা অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পালিত হয়। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ব্যাজ বিক্রি করে ২১শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনের জন্য ছাত্রছাত্রীরা অর্থসংগ্রহ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি থেকে ঢাকা শহরে একমাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভা, শোভা যাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গনে মিলিত হয়। ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে আমতলায় যে ঐতিহাসিক সভা হয় সেখানে ছাত্রনেতা আব্দুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রাসহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর ছাত্রছাত্রীরা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ভেদ করে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিতে দিতে প্রাদেশিক ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। তখনই নুরুল আমীনের নির্দেশে পুলিশও ই.পি.আর. নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদনে গ্যাস নিক্ষেপ ও গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় বরকত, সালাম, জব্বার ও রফিক। এছাড়া ১৭জন যুবক আহত হন এবং অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনা আন্দোলনকে আরো জোরদার করে নতুন স্তরে উন্নীত করে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর এ ঘটনা পূর্ববঙ্গের সর্বক্ষেত্রে সর্বসাধারনের কাছে এক বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। ২১শে ফেব্রুয়ারীর এ নৃশংস ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী পূর্ববাংলার আপামর জনগণ পূর্ণ হরতাল পালন ও সভা শোভাযাত্রা করেন। সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে নুরুল আমীন সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে এক গৌরবময় ইতিহাসের জন্ম দেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলে আবারো গুলি চালান হলে শহীদ হন শফিউর রহমান (শফিক), রিক্সাচালক আউয়াল ও নাম না জানা এক কিশোর।[২৩]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষা আন্দোলনের সময় জনগনের বিশেষ কোন ভূমিকা না

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে জনগণ এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। শুধু তাই নয়, সে সময় সাধারণ মানুষের এ সক্রিয়তা ব্যতিত ২২শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো এবং যেভাবে বিকশিত হয়েছিলো সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এছাড়া ঢাকার বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার যেভাবে ঘটেছিল তার থেকেই প্রমানিত হয় যে, ১৯৫২ সালে জনগনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলোর সঙ্গে এ আন্দোলনের একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বে স্থাপিত হয়েছিলো। এবং ঐ ঐক্যের সূত্র ধরেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপকতা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। বদরুদ্দীন ওমর - ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃঃ-৪২৮

২। দ্রষ্টব্যঃ "বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা প্রীতি" মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, "ভাষা আন্দোলনের আদিপূর্ব" আবদুল হক।

৩। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ- "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা" প্রকাশনা-দৈনিক আজাদ ২৯শে জুলাই ১৯৪৭ইং।

৪। আশুদাবী কর্মসূচি আদর্শ, প্রকাশক কামরুদ্দিন আহমদ, কনভেনার, গণআজাদী, পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস, জুমরাইল লেন, ঢাকা জুলাই ১৯৪৭

৫। *Ibid*

৬। দ্রষ্টব্য ঃ বিশেষ সাক্ষাৎকার, ঢাকা ডাইজেস্ট, মার্চ ১৯৭৮

৭। আবুল কাশেম- ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বলিয়াদি প্রেস- ১৯৪৭, ১৫ই সেপ্টেম্বর

৮। *Ibid*

৯। দ্রষ্টব্যঃ মোহাম্মদ তোয়াহা, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম, ঢাকা ডাইজেস্ট মার্চ ৭৮

১০। *Ibid*

১১। দ্রষ্টব্য ঃ দৈনিক আজাদ ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৭

১২। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবুল কাশেম। "প্রথম সভা ও মিছিল" দৈনিক বাংলা ১৩ই ফেব্রুয়ারী '৮৩

১৩। দৈনিক আজাদ, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৭, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, কয়েকটি দলিল, বাংলা একাডেমী।

১৪। নুরুল হক ভূঁইয়া, ঢাকা ডাইজেস্ট, নভেম্বর ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫। দৈনিক আজাদ ২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৮

১৬। দৈনিক আজাদ ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৮

১৭। সৈনিক ২০শে মার্চ ১৯৫৩

১৮। দ্রষ্টব্য ঃ "বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ" দ্বিতীয় খন্ড, কামরুদ্দীন আহমেদ ঢাকা ডাইজেস্ট জুন ১৯৭৯, ডক্টর নুরুল হক ভূঁইয়া নভেম্বর ১৯৭৮

১৯। বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, আগস্ট সেপ্টেম্বর।

২০। মোহাম্মদ তোয়াহা *Op.cit*

২১। কামরুদ্দীন আহাম্মদ জুন ১৯৭৯, ঢাকা ডাইজেস্ট।

২২। *Jinnah: Some speeches as Governor-General of Pakistan pp-৮২-৮৬*

২৩। মোঃ মোজাম্মেল হক- বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি। হাসান বুক হাউস ৬৫, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩. স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গ ঃ-

৩.১ - ৫৪ সনের নির্বাচন ঃ-

১৯৪৭ সালের ভারত-স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক আইনসভা ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যগণ প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগন ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।[১] প্রচলিত সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ১৯৫১ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে এপ্রিল পুর্ব বাংলায় প্রথম টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হওয়ার পর তাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতি দেখা দেয়। মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশংকায় ৩৪টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলা আইনসভায় যে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল তা করতেও তারা সাহস পাননি।

যেহেতু ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী জনগনের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। তাই অবশেষে পূর্ব বাংলার এই জাগ্রত চেতনার আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালের ১১ই মার্চ প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পুর্ব বাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। এ নির্বাচনের ফলে বাঙালী জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ জোরদার হতে থাকে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ শাসনের বিমাতাসূলভ আচরনের প্রতি বাঙালীদের বিরোধীতার প্রকাশ ঘটে। তারা তাদের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকারের দাবীর প্রতি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন জানায়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন হচ্ছে ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ৯টি, নির্দলীয় সদস্যগণ ৪টি এবং খেলাফতে রব্বানী ১টি আসন লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২টির মধ্যে কংগ্রেস দল ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন

Dhaka University Institutional Repository

২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিষ্টান ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কমিউনিষ্ট পার্টি ৪টি এবং নির্দলীয় সদস্য ১টি আসন লাভ করে।[৩]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিজয় পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব রাখে। এটা প্রমান করে যে, পূর্ববাংলার জনগণ পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে সম্পূর্ণ একতাবদ্ধ এবং তাদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সবাই বদ্ধ পরিকর। এটা আরও প্রমান করে যে, মুসলিম লীগ নহে, একমাত্র যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে একে প্রকৃত প্রতিনিধিত্বশীল করার দাবী উথাপন করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় দলের একচেটিয়া কর্তৃত্বকে ধ্বংস করে। গণপরিষদের মুসলীম লীগ দলীয় বাঙালী সদস্যরা আর প্রদেশের প্রতিনিধি নন বলে প্রমাণিত হয়। কারন এ নির্বাচনে তাদের দলের ভরাডুবি হয়েছিল। এ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যথার্থ বিরোধীদলের উন্মেষ ঘটে। পাকিস্তানী শাসকগোষ্টি রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবীতে বাঙালীদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন রয়েছে এটা বুঝতে পারে। ফলে গণপরিষদে ১৯৫৪ সালে উর্দুর সাথে বাংলাও রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম গণপরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এবং দ্বিতীয় গণপরিষদে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি হিসেবে যুক্তফ্রন্টের অঙ্গদলগুলির সদস্যগণ নির্বাচিত হন। এর ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের মুসলিম লীগের শাসনের অবসান ঘটে। পূর্ববাংলায় জাতীয়তাবাদী এলিটগণ ক্ষমতার অংশীদার হন।[৪] এর ফলে পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের ক্রোধ আরো বেড়ে যায় এবং পূর্ব বাংলার সাথে তাদের সম্পর্কের ক্রমশঃ অবনতি ঘটে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আরও প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ববাংলার জনগণ তাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। বাঙালী জনগণের সংহতি ও সচেতন বোধ আরো সুদৃঢ় হয়। এরই ফসল আজকের সার্বভৌম বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৪ সালের নির্বাচনের পর আরও তা জোরদার হয়। ভাষা আন্দোলনের ফলে যে অসম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তারই পথ ধরে উক্ত নির্বাচনে সেই ধারাই জয়যুক্ত হয়। এর ফলে পরবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

সময়ের রাজনীতিতে অসম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা আরও বিস্তৃত হয়। তৎকালীন বৃহত্তম বিরোধী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ নিজেকে অসম্প্রদায়িক দল হিসেবে পূর্ণগঠিত করে এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বাঙালী জনগনের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপুর্ণ ভূমিকা রাখে। যারই ফলশ্রুতিতে আমরা আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের অধিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি।

৩.২ ঃ- যুক্তফ্রন্ট গঠন ঃ-

১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ স্বপ্ন দেখেছিল তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পেয়ে সুখীভাবে জীবন যাপন করবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত করেই পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসূলভ আচরন বাঙালীর মনের সব আশা আখাংকাকে ধুলিসাৎ করে। বিভিন্ন ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক ও উপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এতে সকল ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভার নির্বাচনে মুসলীম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিলো। এর পেছনে সর্বাধিক অবদান ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্বাচন শেষে সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ জিন্নাহ-নাজিমুদ্দিন- লিয়াকত আলীর পকেট সংগঠনে পরিণত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের সকল রীতিনীতি উপেক্ষা করে জিন্নাহ-লিয়াকত আলী খান সোহরাওয়ার্দীকে অপসারন করেন। খাজা নাজিমুদ্দিনকে মূখ্যমন্ত্রী করা হয়। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলীম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এরূপ পরিস্থিতিতে মাওলানা ভাষানীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে এ বিক্ষুব্ধ মুসলিম লীগের সদস্যদেরকে নিয়ে "আওয়ামী মুসলিম লীগের" জন্ম হয়।[৫] এতে করে বাঙালীদের দাবী দাওয়া প্রকাশ করার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। মুসলিম লীগের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরোধী রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিলো। এ আওয়ামী মুসলিম লীগ বাঙালীদের দাবী দাওয়া পেশ করার একটি সাংগঠনিক মুখপাত্রে রূপান্তরিত হয়। এর কিছুদিন পর পাকিস্তানের মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। তখন বাঙালী নেতাগন সবাই একতাবদ্ধ হয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে একটি মহাজাতীয় সম্মেলনে মিলিত হন। এ সম্মেলনে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প সহ বিকল্প সাংবিধানিক প্রস্তাবলী গৃহিত হয়। "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন" বাঙালী জনগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে পূর্ববাংলার জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকান্ড, রাজবন্দীদের উপর নির্যাতন, কৃষক বিদ্রোহ দমনে পাশবিক নির্যাতন, লবন সংকট পাট শিল্পের কেলেংকারি এবং বিভিন্ন ধরনের গণবিরোধী কাজের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। তাই ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে নির্বাচন ঘোষিত হলে মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাষানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করে এবং নির্বাচনী জোটে একতাবদ্ধ হন। পরবর্তীতে "গণতন্ত্রী দল" "নেজামে ইসলাম" খেলাফতে রব্বানী পার্টি যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়।[৬] ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় ও শক্তিশালী করার জন্য বিরোধী দলগুলো এ "যুক্তফ্রন্ট" গঠন করে। আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী ও কৃষক শ্রমিক দলের ফজলুল হকই প্রধানতঃ যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্ব দেন। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্যই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১টি দফায় বিন্যস্ত করা হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল "নৌকা"।

৩.৩ যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনী মেনিফেস্টো ঃ-

যে নিন্মতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহাই ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচি, "২১ দফা ভিত্তি নির্বাচনী মেনিফেস্টো রচনা করেন আবুল মনসুর আহমদ, কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(১) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা।

(২) বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে সকল প্রকার খাজনা আদায়কারী স্বত্বের বিলোপ সাধন করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। ভূমি রাজস্বকে ন্যায়সঙ্গত স্তরে নামিয়ে খাজনা এবং সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা।

(৩) পাট ব্যবসায় জাতীয়করন, পাট উৎপাদনকারীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা, মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(৪) সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, কুটির শিল্পের বিকাশ ও শ্রমজীবিদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

(৫) পূর্ব বাংলাকে লবনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। মুসলিম লীগ শাসনামলে লবন কেলেংকারীর তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা এবং তাদের অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা।

(৬) অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পূর্নবাসন করা।

(৭) খাল খনন, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে দুর্ভিক্ষ রোধ করা।

(৮) পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং আই,এল, ও কনভেনশন অনুযায়ী শিল্প শ্রমিকদের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

(৯) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(১০) শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা।

(১১) বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল প্রতিক্রিয়াশীল কালাকানুন বাতিল করে একে পূর্ণ স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) প্রশাসনিক ব্যয়সংকোচ ও কর্মচারীদের বেতনের সামঞ্জস্য বিধান করা। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কোন মন্ত্রীর এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা।

(১৩) দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষখোরী উচ্ছেদ করা। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের পর হতে সকল কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা এবং সকল অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

(১৪) সকল নিরাপত্তাবন্দীকে মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা।

(১৫) শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে পৃথক করা।

(১৬) বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা।

(১৭) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য যারা প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করার জন্য শহীদ মিনার নির্মান করা।

(১৮) একুশে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে তা সরকারী ছুটির দিন হিসেবে পালন করা।

(১৯) ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান, পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন, অস্ত্র কারখানা নির্মান এবং আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২০) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোনক্রমেই আইনসভার আয়ু বর্ধিত করবে না। সাধারণ নির্বাচনের ছয়মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে।

(২১) আইন সভার কোন আসন শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরন করা হবে এবং যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পর পর তিনটি উপনির্বাচনে পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪ নির্বাচনের ফলাফল ঃ-

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগন যুক্তফ্রন্টের ২১দফা কর্মসূচির প্রতি ব্যাপক সমর্থন দেয়। ফলে নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম পরাজয় ঘটে। এবং যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে। আইন পরিষদের সর্বমোট আসন ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে ২৩৬টি আসনই যুক্তফ্রন্ট লাভ করে এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসনে বিজয়ী হয়। বাকী আসনগুলোতে কংগ্রেস, তফসিলী সম্প্রদায় ও অন্যান্য গোষ্টি বিজয়ী হয়।

"২৩৭টি ছিল মুসলিম আসন। তার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি, ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ৯টি, নির্দলীয় সদস্যগন ৪টি এবং খেলাফতে রব্বানী ১টি আসন লাভ করে। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্যগন ১টি আসন লাভ করে।[৮] পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী নিজেও একজন ছাত্রের কাছে পরাজিত হন। এ নির্বাচনের ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা হারায়। যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় নেতা ফজলুল হক পূর্ববাংলার মূখ্যমন্ত্রী হন।

"১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রমানিত হয় যে, বাঙালী জনগনের প্রধান দাবি ছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবি। যুক্তফ্রন্ট বিজয়ের ফলে এই দাবিই জয়যুক্ত হয়। স্বায়ত্বশাসনের দাবি পরবর্তীতে শেখ মুজিবের ৬ দফায় স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। বাঙালী জনগনের নিকট অতি দ্রুত তা সমাদৃত হয়।[৯] এ নির্বাচনের ফলাফল বাঙালী জাতীয়তাবাদকে আরও সুদৃঢ় করে। আর এ জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল হচ্ছে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

৩.৫ যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও সরকারের পতন ঃ-

১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন ঘোষণা করা হলে আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা ভাসানী, আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও কৃষক প্রজাপার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর একটি

Dhaka University Institutional Repository

চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে "যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনী জোটে একতাবদ্ধ হন। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলীম লীগকে পরাজিত করা। মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্যই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি "২১টি" দফায় বিন্যস্ত করা হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল "নৌকা"।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিশেষ কতগুলো কারনের ফলেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল এবং সরকারের পতন ঘটেছিলঃ-

প্রথমত ঃ ১৯৪৬ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের আইন পরিষদ সদস্যদের বিশেষ অধিবেশনে মূল লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত "রাষ্ট্রসমূহ" শব্দটির পরিবর্তে "রাষ্ট্র" শব্দটি সংস্থাপন করায় অবিভক্ত বাংলার অনেক নেতারাই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তাঁদের মধ্যে আবুল হাশেম, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী প্রমূখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পাকিস্তানে প্রগতিশীল নেতাকর্মীগন মুসলিম লীগের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেন এবং নতুন দল "আওয়ামী মুসলিম লীগ" গঠন করায় মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে কোন্দল দেখা দেয়। দলের আভ্যন্তরীন কোন্দলের ফলে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেশবাসীর মনে দলটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। যারই বহিঃপ্রকাশ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল।

দ্বিতীয়তঃ-

২১শে ফেব্রুয়ারীর মর্মান্তিক ঘটনাও এ সরকারের পতনের একটি মূল কারণ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শুরু হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করেন। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগান দিয়ে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা সশস্ত্র সেনাদের উপেক্ষা করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনই মুসলিম লীগের মূখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নির্দেশে পুলিশ মিছিলের উপর গুলি চালায়। এতে সালাম, বরকত, জব্বার প্রমূখ অনেক সম্ভাবনাময় তরুন শহীদ হন। এ নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে সমগ্র দেশের আপামর

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণ মুসলীম লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকারের পতন ঘটে এবং যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে।

তৃতীয়তঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগের ছিল অগনতান্ত্রিক মনোভাব। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত একটি উপনির্বাচনে পরাজয়ের ফলে মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতি দেখা দেয়। ফলে ১৯৫১ সালে যে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল মুসলিম লীগ তা স্থগিত রাখে। এবং আইনসভার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়। এ গণতন্ত্র বিরোধী কাজের ফলে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা আরো ক্ষুন্ন হয়।

চতুর্থতঃ

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ন আঞ্চলিক স্বাযত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি পূর্ববাংলার জনগনকে পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্টার পর মুসলিম লীগ সরকার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে এবং একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। মুসলিম সরকার স্বায়ত্বশাসন প্রদানের পরিবর্তে জনগনের উপর শোষন ও জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্জনের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে জনগনের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মূল বক্তব্যই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা জনগনের আস্থা লাভ করে এবং মুসলিম লীগ সরকার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

পঞ্চমতঃ

মুসলিম লীগ সরকার কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বাঙালীদের ন্যায্য অংশ দিতে অস্বীকার করে। ১৯৫০ সাল হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সংবিধান সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটির যে তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলাকে কার্যতঃ সংখ্যালঘিষ্টে পরিণত করতে চাওয়া হয়।

ষষ্ঠতঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সরকার পূর্ববাংলার স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে আসছিল। রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব উর্দুবাসী ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দ এবং পাঞ্জাবী আমলা সেনাবাহিনীদের হাতে চলে যায়। এ মহলই বাঙালীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে সৃষ্ট এ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিমাতাসূলভ আচরনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিলেন। এর ফলে জনগন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সরকারের বিপক্ষে এবং যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে।

সপ্তমত ঃ

মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে দেশে খাদ্য সংকট, লবন সংকট ও বন্যা সমস্যা দেখা দেয়। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার দ্বন্দে লিপ্ত থাকে এবং এসব সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দিতে ব্যর্থ হয়। এমনকি মুসলিম লীগ সরকারের পাট কেলেঙ্কারিও ফাঁস হয়ে পড়ে। ফলে পূর্ববাংলার জনগন সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। অপর দিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাদের ২১ দফা কর্মসূচিতে লবন সংকট, খাদ্য সংকট ও বন্যা সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান ও মুসলিম লীগ সরকারের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পরিচালনার ঘোষনা জনগনকে আশান্বিত করে তোলে।

অষ্টমত ঃ

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন কামী ছাত্র-যুবক-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে "দেশদ্রোহী" বলে আখ্যায়িত করে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে "ভারতের অনুচর", কম্যুনিষ্ট" আখ্যায়ও আখ্যায়িত করা হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এ নির্যাতিতরাই যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এর ফলে উক্ত নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনগণ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে এবং সরকারের বিপক্ষে রায় প্রদান করে।

নবমতঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবিগন ব্যাপক হারে ভারত চলে যায়। ফলে সে শুন্যস্থান পূরন করার জন্য এক শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এ বিকাশমান মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেনীর সাথে অতি শীঘ্রই মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃবৃন্দের স্বার্থের দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। এ দ্বন্ধে সচেতন মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেণী মুসলিম লীগের পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের পথ বেছে নেয়।

দশমতঃ

সরকারের উদাসীন্য এবং মুসলিম লীগের আশ্রয়পুষ্ট মজুতদার, কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের ষড়যন্ত্রে খাদ্য দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববঙ্গে এক রকম দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম অধিকহারে বেড়ে যায়। এ দুর্ভিক্ষাবস্থা ও অব্যবস্থা জনসাধারনের মধ্যে দারুন হতাশার সৃষ্টি করে। তারা স্বাভাবিক ভাবে সরকারের পরিবর্তন চায় এবং ব্যাপক হারে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে মুসলিম লীগ শাসনের অবসান ঘটায়।

একাদশতম ঃ

পাকিস্তান সৃস্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকার ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় মুসলিম লীগ নেতৃত্বাধীন 'গনপরিষদ' সংবিধান প্রনয়নে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। অপর দিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত সংবিধান প্রনয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে

Dhaka University Institutional Repository

জনগন যুক্তফ্রন্টের প্রতি সমর্থন জানায়। যারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে এবং মুসলিম লীগ সরকারের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে বিশেষ কতকগুলো কারনের ফলে মুসলিম লীগ সরকার শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরন করে। এবং যুক্তফ্রন্ট বিজয় লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। আবুল ফজল হক - বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি। প্রকাশক - টাউন স্টোর্স রোড রংপুর। ১৯৯৮ইং, *p* -৫৮

২। মোঃ মোজাম্মেল হক - বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, হাসান বুক হাউস ৬৫ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকা। ১৯৯৭ *p*-১৫৫

৩। *Ibid pp*- ১৫৭-১৫৮,

৪। আবুল ফজল হক *Ibid p*-৬২,

৫। মোঃ মোজাম্মেল হক *Op.cit p*-১৫৫,

৬। *Op.cit*

৭। আবুল ফজল হক *Op.cit pp*-৫৯-৬০

৮। মোঃ মোজাম্মেল হক *Op.cit p*-১৫৮

৯। *Op.cit p*-১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪। পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান (১৯৫৬ সন) ঃ-

৪.১ সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। এ দেশের কল্যানের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দেখা দেয় একটি সংবিধান প্রনয়নের। এ সংবিধান প্রনয়নের জন্য তাই প্রথম গণপরিষদের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইনের দ্বারা পাকিস্তান গণপরিষদকে সংবিধান প্রনয়নের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। সংবিধান প্রনয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণপরিষদ ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আদর্শ প্রস্তাব নামে একটি প্রস্তাব গ্রহন করে। এ প্রস্তাবে সংবিধানের মূল আদর্শের উল্লেখ ছিল। তাছাড়া গণপরিষদ সংবিধানের কাঠামো ও মূলনীতি নির্ধারনের জন্য মূলনীতি কমিটি নামে একটি কমিটিও নিযুক্ত করে। এ কমিটি তিনজন প্রধান মন্ত্রীর আমলে তিনটি রিপোর্ট প্রনয়ন করে।[১]

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্ট ১৯৫০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর গণপরিষদে পেশ করা হয়। এ রিপোর্টে বলা হয়, একমাত্র উর্দু পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হবে। এ রিপোর্ট ছিল পূর্ব বাংলার স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। বাংলা ভাষা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট লোকের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ "অন্তবর্তীকালীন রিপোর্টের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ও সমালোচিত বিষয় ছিল একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ। এ সুপারিশ প্রকাশিত হলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।"[২]

১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর খাজা নাজিমুদ্দীন মুলনীতি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করেন। ঐ রিপোর্টেও রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। ফলে বাঙালীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে।

খাজা নাজিমুদ্দীনের পর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁরই নেতৃত্বে মূলনীতি কমিটি আর একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে এবং তা ১৯৫৩ সালের

Dhaka University Institutional Repository

অক্টোবর মাসে এটা গণপরিষদে পেশ করা হয়। বহু আলাপ আলোচনার পর ১৯৫৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তা গৃহীত হয়। এ রিপোর্টে বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সকল সমস্যার মূলে ছিল পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব। অন্যভাবে বললে, বাঙালি-পাঞ্জাবি দ্বন্দ্ব। উভয়ের স্বার্থের সমন্বয় সাধন ছিল এক কঠিন কাজ। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে শুধু বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে সম্মত ছিল না তা নয় । তারা কোন ভাবে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও মেনে নিতে পারছিলনা। তাই, এর মোকাবিলায় একের পর এক ফর্মুলা উদ্ভাবন করছিল। এ দ্বন্দ্বের কারনেই মূলত পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন এতো বিলম্বিত হয়।[৩]

১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই মারীতে দ্বিতীয় গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। ঐ সময় মারীতে পাকিস্তানের সকল প্রদেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ভবিষ্যৎ সংবিধানের কাঠামো সম্পর্কে কয়েক দফা আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তারা একটি সমঝোতায় উপনীত হন। এটাই "মারী চুক্তি" নামে খ্যাত। এ চুক্তির ৫টি দফার মধ্যে একটি দফা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ হতে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন মোস্তাক আহমদ গুরমানী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, ডাঃ খান সাহেব ও মোহাম্মদ আলী এবং পূর্ব বাংলার পক্ষে স্বাক্ষর দেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এ,কে, ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমদ।[৪]

মারী চুক্তি অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে এক ইউনিটে পরিণত করে দ্বিতীয় গণপরিষদে একটি বিল পাস হয়। মারী চুক্তিতে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে এ,কে ফজলুল হক, হোসেন সোহারাওয়ার্দী প্রমুখ স্বাক্ষর দান করা সত্ত্বেও বিশেষ করে সংখ্যাসাম্যনীতির বিরুদ্ধে বাঙালীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

দীর্ঘ ৯ বছরের প্রয়াস প্রচেষ্টার পর অবশেষে পাকিস্তানের পক্ষে একটি সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হয়। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী দ্বিতীয় গণপরিষদে এ মর্মে একটি বিল উত্থাপিত হয়। ২৯ ফেব্রুয়ারী এটা গৃহীত হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস থেকে তা কার্যকর হয়। এ সংবিধান প্রণয়নে হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে প্রথম গণপরিষদ ও দ্বিতীয় গণপরিষদ বিভিন্নমূখী সমস্যার সম্মুখীন হয়। ফলে সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এই সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি ছিল রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষার প্রশ্নে বিভিন্ন মতবিরোধ দেখা দেয়। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% বাঙালি হলেও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু হয়। পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ২১ শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" এই ঘোষনা প্রদান করলে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়। ১৯৫০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত "মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে" উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ ও গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। ফলে গণপরিষদ "মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট" বিবেচনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।[৬]

১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা দেওয়ার ফলে বাঙালিদের একটি প্রধান দাবী পূরণ হয়।

বহু চেষ্টা সাধনার পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে একটি সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব হয় বটে, তবে বেশি দিন তা কার্যকর হয়নি, মাত্র ২ বছর ৬ মাস ১৫দিনের মধ্যে ১৯৫৬ সালের ৭ই অক্টোবর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক তা বাতিল ঘোষিত হয়। তিনি সারাদেশে সামরিক আইন জারি করেন।[৭]

যদিও ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি ছিল তথাপি ছাত্র সম্প্রদায় পিছপা হয়নি। তারা প্রতি বৎসর শহীদ দিবস পালন করেছে। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, বাংলা নববর্ষ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করে বাংলার সংস্কৃতিকে সম্মুন্নত করে রেখেছে। ঐ সময় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার সকল প্রকার আইয়ুবী প্রচেষ্টাকে তারা সফল ভাবে প্রতিরোধ করে।

৪.২ - স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গ ঃ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুর্ববাংলার জনগণ আশা করেছিল যে

Dhaka University Institutional Repository

এবার তাদের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু শাসক দল হিসেবে মুসলীম লীগ তাদের আশা আকাঙ্খা পূরনে ব্যর্থ হয়। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাযত্বশাসনের প্রতিশ্রুতি পুর্ব বাংলার জনগণকে পাকিস্তান আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলীম লীগ সরকার পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যায়িত করে। তাই দেখা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্টার পর পরই গণতান্ত্রিক যুবলীগের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রাজনীতিক যুব কর্মী সম্মেলনে গঠিত যুব ইস্তাহারে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র, স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গে পরিস্কার দাবী তোলা হয়।

"রাষ্ট্রের অধীনস্থ বিভিন্ন এলাকার পৃথক পৃথক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশকে সরকার স্বীকার করিয়া নিবেন, জীবন এবং সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে এইসব এলাকার সকল ব্যাপারে স্বায়ত্বশাসন মানিয়া লইতে হইবে।"[৮]

সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম গণপরিষদ গঠিত হয়। এতে সংবিধানের কাঠামোও মূলনীতি নির্ধারনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। একে মূলনীতি কমিটি বলা হয়। এ কমিটি থেকে তিনজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তিনটি রপোর্ট পেশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নেতৃত্বে প্রথম রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করা হয় ১৯৫০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। এ রিপোর্টে বিভিন্ন প্রকারের পাশাপাশি প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের বিষয়টিও ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কোন নিশ্চয়তা ছিল না। এতে করে স্বভাবতই এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষ তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং অবশেষে গণপরিষদে এ আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

খাজা নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ হয় ১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর। এ রিপোর্টেও পূর্ববাংলার জনগনের আশা আকাঙ্খা অনুসারে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে জনগনের কাছে নাজিমুদ্দীনের এই রিপোর্ট সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য ছিলনা।

দ্বিতীয় গণপরিষদ ১৯৫৫ সালের ৭ই জুলাই মারীতে প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়। এ অধিবেশনে পাকিস্তানের সকল নেতাগন কয়েকটি আপোষ চুক্তি সম্পাদিত করেন তার মধ্যে একটি চুক্তি ছিল। উভয় প্রদেশকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

"লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রদেশগুলোতে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়নি। সিন্দু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বিশেষ করে পুর্ববাংলার জনগনের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভের ইচ্ছা ছিল প্রবল। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতি ছিল। ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনকামী বনাম শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টি বিরোধের ফলে গণপরিষদদ্বয় সংবিধান প্রণয়নের দীর্ঘ সময় নিতে বাধ্য হয়।"[৯]

হিন্দুদের কবলমুক্তি ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের নামে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলনে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তান কায়েম করে। কিন্তু এই সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারের মধ্যেও বাংলায় নেতৃবর্গ ও জনগন ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে পূর্ববাংলাকে স্বাধীন সাবভৌম স্বায়ত্বশাসিত সত্বা হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করে। বস্তুত, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে "স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম" স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ" গঠনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভৌগলিকভাবে সংলগ্ন ইউনিটগুলোকে নিয়ে এমন ভাবে বিভিন্ন এলাকা গঠন করতে হবে যাতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চলসমূহ পৃথক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সংগঠিত হতে পারে, যেখানে ইউনিটগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।[১০]

শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হকের মত বিচক্ষন বাঙালী নেতা গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হতে যাচ্ছে। সেজন্য ১৯৫৩ সালের ২৪শে অক্টোবর গণপরিষদে তিনি যা বলেছিলেন তাতে পূর্নাঙ্গ স্বায়ত্বশাসনের দাবী উঠে এসেছিল, মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের সমালোচনা প্রসঙ্গে ফজলুল হক বলেছিলেন ঃ "আমি কেবল একটাই সুপারিশ করছি। আমরা যে স্বায়ত্বশাসিত তা বাস্তবে অনুভব করতে চাই, আমাদের নিজেদের সরকার থাকবে, আমরা আমাদের আইন তৈরী করব।"[১১]

তিনি আরো বলেছিলেন ঃ "পাকিস্তানের সকল ইউনিটের জন্য একই সংবিধান হতে পারেনা। এক ইউনিট থেকে অপর ইউনিটে এটা পৃথক হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে তার নিজের ভাগ্য নির্ধারনের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হোক।"[১২]

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুতঃ পাকিস্তানী শাসক-শোসক গোষ্ঠীর উপনিবেশিক নীতির ফলশ্রুতিতেই পূর্ববাংলার জনগনের স্বাতন্ত্র ও স্বাধিকার চেতনার বিকাশ ঘটে। তাদের এই স্বাতন্ত্র ও স্বাধিকার চেতনার মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসনের দাবী ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি ও আশ্রয় করে পুষ্ট হতে থাকে।

জনৈক লেখক বলেন, "যদিও বাঙালীদের সংস্কৃতি স্বায়ত্ব শাসনের খোঁজ উপমহাদেশের ইতিহাসে লক্ষনীয়, তথাপি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের উপনিবেশিক নীতিই তাদের সুপ্ত জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আত্মঘোষণা দানে ইন্ধন যুগিয়েছে।"[১৩]

১৯৫৪ সালের হক-ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচীতেও পূর্ববাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্বশাসনের দাবী উত্থাপিত হয়। এর সাথে সাথে এতদঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে নানা দাবী এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের বলিষ্টতম দাবী উত্থাপিত হয়। ২১ দফা কর্মসূচীর প্রাসঙ্গিক দাবীগুলোর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দাবী ছিল স্বায়ত্বশাসনের দাবী। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায় করা হবে এবং প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে অন্য সকল বিষয় ইউনিট সরকারের অধীনে আনয়ন করা হবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর সদর দফতর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমান আনসার বাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ মিলিশিয়াতে রূপান্তরিত করে অঙ্গসজ্জিত করা হবে।[১৪]

পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববাংলার একত্ব ও সংখ্যা গুরুত্বকে ভয় করত। সেজন্য তারা পশ্চিম পাকিস্তানে একটি ইউনিট গঠন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাসাম্য দাবী করে। পূর্ববাংলার নেতৃবৃন্দ তাদের দাবী মেনে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, যুক্ত নির্বাচন ও সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে সংখ্যাসাম্য প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে করাচীতে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের অধিবেশনে প্রথমে এক ইউনিট বিল উত্থাপন করা হয়। এবং ১৯৫৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এটা গৃহীত হয়। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় এবং সেখানে একটি মাত্র প্রদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারী গণপরিষদে সংবিধান বিল উত্থাপিত হয় এবং ২৯শে ফেব্রুয়ারী এটা গৃহীত হয়। এভাবে দীর্ঘ নয় বৎসর পর পাকিস্তান একটি সংবিধান লাভ করে।[১৫]

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা ছিল না। সরকারের ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও যুগ্ম এ তিনটি তালিকায় বিভাগ করা হয়। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট বিষয় ওমুদ্রা ব্যতীত আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাছাড়া যুগ্ম তালিকাভূক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্রও প্রদেশের মধ্যে বিরোধ ঘটলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই প্রাধান্য লাভ করত। এমন কি, প্রাদেশিক তালিকাভূক্ত বিষয়গুলোর উপরেও প্রাদেশিক সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আন্তর্জাতিক অন্তর্ভূক্তি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধ করলে কেন্দ্রীয় আইনসভা যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শাসন ও আইনপ্রনয়নের ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করতে পারত। শাসন ক্ষমতা কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিতে পারত। প্রাদেশিক গভর্নরগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং রাষ্ট্রপতি যতদিন সন্তুষ্ট থাকতেন ততদিন তারা পদে বহাল থাকতেন। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট সুযোগ পেত। এটা ছিল স্বায়ত্বশাসন নীতির পরিপন্থী।[১৬]

১৯৫৬ সালের সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের আশা আকাংখার কোন পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে সুস্পষ্ট রায় দেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালের সংবিধান পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দান করতে ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। আবুল ফজল হক- বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রকাশক - টাউন স্টোর্স, ষ্টেশন রোড রংপুর, ষষ্ঠ সংস্করন ১৯৯৮ *p.p.* - ৬৪-৬৫

২। *Dr. Mozzaffar Ahmed chowdhury-"Govt and politics in pakistan" p.p.-44-46* এবং *Rounaq Jahan- "Pakistan: Failure in national integration" p.p. 36-37.*

৩। হারুন-অর-রশিদ- বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০. প্রকাশক-নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১০০০. *p*-২০৩

৪। আবুল ফজল হক, *Ibid p*-৭০

৫। হারুন-অর-রশিদ - *Ibid p*-২০৫

৬। মোঃ মোজাম্মেল হক - বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি। প্রকাশক হাসান বুক হাউস, ৬৫-প্যারীদাস রোড বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ *p*-১৩১।

৭। হারুন-অর-রশিদ-*Opcit p*-২০৭

৮। আমরা গড়িব সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান, ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষে শামসুল হক কর্তৃক ১৫০, মোগলটুলী হতে প্রকাশিত, এ,এইচ, সৈয়দ কর্তৃক বলিয়াদী প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত *p*-৩৪

৯। মোঃ মোজাম্মেল হক *Ibid p*-১৩১

১০। হাসান উজ্জামান-বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম প্রকাশক-পল্লব পাবলিশার্স, ৩১ মিরপুর রোড ঢাকা-১২০৫, ১৯৯২, *p*- ১৭-১৮

১১। কন্সটিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী অফ পাকিস্তান ডিবেটস, ২৪শে অক্টোবর ১৯৫৩, *p*- ৪০০

১২। *Ibid*

১৩। শিশির গুপ্ত সেমিনার ১৪২, দিল্লী-জুন ১৯৭১ *p*-১০

১৪। হাসান উজ্জামান *Ibid p* - ২৭

১৫। আবুল ফজল হক *Op.cit*

১৬। আবুল ফজল হক *Op,cit-pp.* ৭১-৭২

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫ ঃ পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসন ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অবসান ঃ-

অনেক সাধনার পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু তা বেশিদিন কার্যকর থাকতে পারেনি। মাত্র ২ বছর ৬ মাস ১৫ দিনের মধ্যে তা বাতিল বলে ঘোষিত হয়। এবং সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়।

"চল্লিশের দশকে যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন সংঘঠিত হয়েছিল। সেই মুসলিম লীগের স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের জন্য অন্যান্য দলগুলো বিকাশ লাভ করতে পারেনি। এতে মুসলিম লীগ দ্রুত জনপ্রিয়তা হারায়। যখন ১৯৫৬ সালে সংবিধান অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা স্বৈরতান্ত্রিক আচরণ শুরু করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর এক আদেশ বলে তিনি সংবিধান বাতিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদ ও প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদ বিলুপ্ত, জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল এবং সামরিক আইন জারি করেন। জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রকাশক নিযুক্ত হন। ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খানের মধ্যে ক্ষমতার দন্দ্ব শুরু হয়। অবশেষে ইস্কান্দার মীর্জাকে পরাজিত করে জেনারেল আইয়ুব খান ২৭শে অক্টোবর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক থেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন। তার নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিশন সামরিক আইন জারির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন সংসদীয় সরকার তিনটি কারনে ব্যর্থ হয়েছে। কারনগুলো হলো ঃ-

(১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের অভাব ও ত্রুটিপূর্ন সংবিধান।

(২) মন্ত্রীসভা, রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উপর রাষ্ট্রপ্রধানের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ এবং

(৩) নেতৃত্বের সঙকট, সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অভাব, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভাব এবং প্রশাসনে তাদের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ।[১]

১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে হোসেন শহীদ

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী পদত্যাগ করেন। এর পর আই,আই চুন্দ্রীগড় রিপাবলিকান পার্টির সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকার গঠন করেন। তাঁর সরকার দুই মাসের কম সময় স্থায়ী হয়। এরপর ১৯৫৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর রিপাবলিকান পার্টির সংসদীয় দলের নেতা মালিক ফিরোজ খান নুন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে তাঁর এই মর্মে সমঝোতা হয় যে, দেশে যথা সম্ভব খুব তাড়াতাড়ি একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আরও স্থির করা হয় যে, ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে এ নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল কৃষক শ্রমিক পার্টির মধ্যে ১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এক অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত হয়। এ ঘটনা চলাকালীন সময়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মাথায় মারাত্মক আঘাত পান এবং তিনদিন পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২]

এই রকম পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। একই সঙ্গে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহনের কথা ঘোষণা করা হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ-

১। সংবিধান বাতিল।

২। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত।

৩। জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেওয়া।

৪। সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং

৫। জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ।[৩]

সামরিক শাসন জারি করার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়।

রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মীর্জা নিজের গদি সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তখনকার সময় পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাবলিকান পার্টি এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ এত বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, নির্বাচনে তাদের নিজস্ব অঞ্চলগুলোতে জয়লাভের সম্ভাবনাও

Dhaka University Institutional Repository

দেখা দেয়। কিন্তু ইস্কান্দার মীর্জা তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের উপর নির্ভর করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া সামরিক অধিনায়ক ও উচ্চপদস্থ আমলাগন এবং পশ্চিমা স্বার্থান্বেষী মহল প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতাও ইস্কান্দার মীর্জাকে আরও বেশি ক্ষমতালিপ্সু করে তোলে। ফলে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি হয়।

সামরিক শাসন জারি করার ২০ দিনের মাথায় অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেন। শুরু হয় আইয়ুবী শাসন। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তার পর পরই ঐ সংবিধানও বাতিল হয়ে পড়ে। এভাবে সামরিক শাসন জারির পর আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করার সঙ্গে সঙ্গে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

৫.১ : ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের ২য় সংবিধানের আবির্ভাব ও রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন ঃ-

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের নেতৃত্বে একটানা পাকিস্তানের সামরিক শাসন জারি ছিল। ১৯৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থাসূচক ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর তিনি একটি সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি প্রায় চার মাস পরিশ্রম করে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। এই নতুন সংবিধান ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করে সর্বসাধারনে ঘোষণা করেন। এটাই ১৯৬২ সালের সংবিধান।

১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ঃ-

১। ১৯৬২ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি "ইসলামী প্রজাতন্ত্র" হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন প্রণীত হবে না বলে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, গবেষণাগার ও ইসলামী উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধানে বলা হয় যে, একমাত্র মুসলমানই হবেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি।

২। এই সংবিধান ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। এটি ১২টি অংশে বিভক্ত ছিল। এই সংবিধানে ২৫০টি ধারা ও ৩টি তালিকা ছিল।

৩। এই সংবিধান ছিল দুস্পরিবর্তনীয়। সংবিধান সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য ও রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন ছিল।

৪। ১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান ও সরকার প্রধান। ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হতেন। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। কিন্তু মন্ত্রীগন রাষ্ট্রপতির কর্মচারী মাত্র সহকর্মী নয়।

৫। এই সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলো প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬। এই সংবিধানে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থেকে নিয়ন্ত্রনমুক্ত রাখা হয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

৭। এই সংবিধানে মৌলিক অধিকারের পরিবর্তে ১৬টি আইন প্রণয়নের মূলনীতি সংযোজন করা হয়। তবে ১৯৬৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের তালিকা সংযোজন করা হয়েছিল।

৮। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের মত এই সংবিধানেও কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রবর্তন করা হয়।

৯। ১৯৬২ সালের সংবিধানে ২১টি নীতি নির্ধারক মূলনীতি সন্নিবেশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১০। এই সংবিধানে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরনের ব্যবস্থা করা হবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এই সংবিধান যে আমলে প্রণীত হয়েছিল সেই শাসন আমলে পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলছিল।

১১। ১৯৬২ সালের সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানের চল্লিশ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের বিধান করা হয়।[৪]

১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। এ সংবিধানে পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। ৮০ হাজার নির্বাচক মন্ডলীর ভোটে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচক মন্ডলীর সংখ্যা ছিল সমান সমান। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি ছিল। এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মূলতঃ ১৯৬২ সালের সংবিধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চেয়েও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল বেশি। অথচ তিনি ছিলেন পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত। কোন কোন বিলে সম্মতিদানের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে উল্লেখিত ক্ষমতার চেয়ে চেশি। রাষ্ট্রপতি কোন বিলে অসম্মতি জানালে জাতীয় পরিষদ তা পূর্ণ বিবেচনা করে দুই তৃতীয়াংশ অনুকূল ভোট সংগ্রহ করার পরও রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন হত। আইনসভার সার্বভৌমত্বকে কলঙ্কিত করার পরিমেয় ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রপতির। তিনি তার সাহায্য ও পরামর্শের জন্য মন্ত্রী পরিষদ নির্বাচন করতে পারতেন। এমনকি তাদের বেতন ভাতার নির্ধারনের ক্ষমতাও ছিল রাষ্ট্রপতির হাতে। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ব্যবধান আরও বৃদ্ধি করে। আইয়ুব খানের ধারনা ছিল, একক কেন্দ্র নির্ভর শক্তির মাধ্যমে প্রদেশের ঐক্য সংহত এবং পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা সম্ভব। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কাছ থেকে তিনি এ ধারণা লাভ করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক গণতন্ত্রের নামে জনসাধারণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আইয়ুব খান পাকিস্তানে একনায়কতন্ত্র চালু করেন। তার সঙ্গে তার স্বার্থের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে তোলেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সকল স্বীকৃত নীতিকে উপেক্ষা করে সমস্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এমন কি মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের হাতেও কোন কার্যকরী ক্ষমতা ছিল না।

১৯৬৪-৬৫ সংবিধানের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল বিরোধী দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহন করে। সম্মিলিতভাবে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনীত করা হয়। এ সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আবার সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাদের ৯ দফা কর্মসূচীর মধ্যে ছিল প্রত্যক্ষ নির্বাচন, খাঁটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, ১০ বৎসরের মধ্যে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যের বৈষম্য দূরীকরন, সাধারন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নকল্পে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহন এবং একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রণ। এ কর্মসূচী জনগনের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করে। কিন্তু মৌলিক গণতন্ত্রীগণ জনগনের আশা আকাংখার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আইয়ুব খানকে পুনরায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদেও আইয়ুব খানের মুসলীম লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচন এটাই প্রমান করে যে, মৌলিক গণতন্ত্রীর অধীনে আইয়ুব খানকে অপসারিত করা যাবে না এবং প্রকৃত গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বাযত্বশাসনও অর্জন করা সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একনায়কত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য এক সাংবিধানিক কৌশল।[৬]

৫.২ : ১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের ছয়দফা ও স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন ঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালীদের উপর শুরু হয় নির্যাতন ও শোষণ। প্রথমে আঘাত আসে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের জনগন বুকের তাজা রক্ত ঢেলে এ ঘৃন্য চক্রান্তকে প্রতিহত করেন। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে ক্রমে অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে চলতে লাগল।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাঙালী জনগনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। আইয়ুব শাসন আমলে "মৌলিক গণতন্ত্রী"দের দুঃশাসনেও জনগন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পুর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। বাঙালী জনগন নিরপত্তাহীনতার অভাব অনুভব করতে লাগল। এ যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সৈনিকদের বীরত্ব পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে প্রদর্শিত হতে থাকলে সমগ্র বাঙালী জাতি আত্মগর্বে বলিয়ান হয়ে উঠে। তাদের মধ্যে এ আত্মবিশ্বাস জন্মে যে যদি সেনাবাহিনীতে পর্যাপ্ত পরিমান নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেলে মাতৃভূমি রক্ষার কাজে তারা যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব পাকিস্তানের উপর নির্যাতন ও শোষন আরও ব্যাপক হারে বেড়ে চলতে লাগল। সরকারের এ হীন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে দেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ জানাতে লাগল। স্বায়ত্বশাসন অর্জনের জন্য এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও বাঙালী সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাঙালী জনগণ যখন বিক্ষুব্ধ তখন শেখ মুজিবুর রহমান এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলগুলোর সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান এ কর্মসূচিটি পেশ করেন। এটাই ঐতিহাসিক ৬ দফা নামে খ্যাত। ৬ দফা প্রকাশ পেলে আইয়ুব সরকার, মুসলিম লীগের সকল অংশ ও জামায়াতে ইসলামী ৬ দফার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।[৭]

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে ছয় দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন শেখ মুজিবুর রহমান। তখন গণভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক দল ছিল ন্যাপ। কিন্তু বিভিন্ন কারনে রাজনৈতিক দলটি সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সুযোগে শেখ মুজিবর রহমান সাংগঠনিক ভিত্তিকে গতিশীল করে তোলেন। তখন রাজনৈতিক কর্মীরা এ দলে সমবেত হতে থাকে।[৮]

পূর্ব পাকিস্তানের "মধ্যবিত্ত ও উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থনকে পুঁজি করে মুজিব জনগনের সমর্থন আদায়ে এগিয়ে যান।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচি ছিল জাতীয় মুক্তির সনদ বা ম্যাগনাকার্টা। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাঙালীদের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে আসছিল। তারা কখনও গণ অধিকার ভোগ করতে পারেনি।প্রথম তারা আঘাত হানে বাঙালীদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর। বাঙালীর সমস্যা প্রকৃতি ছিল জাতিসত্ত্বাগত। এটা যথার্থভাবে চিহ্নিত করেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক কর্মসূচি পেশ করেন। নিম্নে ৬ দফা-দাবীগুলো বর্ণিত হলো ঃ-

১- দফা ঃ ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্র রূপে গড়তে হবে। সেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন ও প্রাপ্ত বয়স্কের সরাসরি ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

২ - দফা ঃ ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় "স্টেট" সমূহের হাতে থাকবে।

৩ - দফা ঃ এ দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব ছিল এবং এদের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহনের দাবী করা হয়। প্রস্তাব দুটি নিম্নরূপ ঃ

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করতে হবে। দু অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র "স্টেট ব্যাঙ্ক" থাকবে। অথবা,

(খ) দু' অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন এক সুনির্দ্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে পূর্ব পাকিস্তান হতে মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ থাকবে এবং দু' অঞ্চলের জন্য দুটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে।

৪ - দফা ঃ সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়যোগ্য অর্থের একটি নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে আপনা আপনি জমা হয়ে যাবে। এ মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে। এভাবে জমাকৃত অর্থ নিয়ে ফেডারেল সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫ - দফা ঃ এ দফায় বৈদেশিক বানিজ্যের ব্যাপারে নিম্নলিখিত শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় ঃ-

(ক) দু' অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখতে হবে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকবে।

(গ) ফেডারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দু'অঞ্চল হতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারে আদায় হবে।

(ঘ) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী রফতানী করা চলবে।

(ঙ) ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে 'ট্রেড-মিশন' স্থাপন এবং আমদানী - রফতানী করবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

৬ - দফা ঃ পূর্ব পাকিস্তানে "মিলিশিয়া" বা "প্যারা-মিলিটারী" বাহিনী গঠন করতে হবে।[১০]

৬ - দফা আন্দোলন ও এর গুরুত্ব ঃ -

৬ - দফা প্রকাশিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়। এমন কি অবাঙালি আমলারা পূর্ববাংলার অবাঙালিদের নিকট আগ্নেয়াস্ত্রও বিতরণ করে। কিন্তু শেখ মুজিব অত্যন্ত সাহসের সাথে সমস্ত ভয়ভীতি ও অপপ্রচারের পরোয়া না করে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রধান প্রধান শহরে জনসভার মাধ্যমে ৬ - দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন। জনসাধারণ এ কর্মসূচীকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেন। শুরু হয় তুমুল আন্দোলন। এ আন্দোলনে ছাত্র যুবনেতা সিরাজুল আলম খান ও আবদুর রাজ্জাকের ভূমিকা ছিল খুবই প্রশংসনীয়।[১১]

৬ দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আইয়ুব খান এ ৬ দফা কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচী বলে আখ্যায়িত করেন। রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে শেখ মুজিবসহ অনেক নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। আওয়ামী লীগ

Dhaka University Institutional Repository

কেঁপে উঠে। বুদ্ধিজীবি, ছাত্রসমাজ, কৃষিজীবি, জনতার এ দুর্বার আন্দোলন শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। এটা পশ্চিম পাকিস্তানেও দানা বাঁধতে থাকে। সর্বস্তরের জনসাধারনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনের ফলে এ আন্দোলন এতই দুর্বার হয়ে পড়ে যে, সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাও অচল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানী শাসন-শোষণ, নির্যাতন পূর্ব বাংলার জনগনের উপর যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ৬-দফা ভিত্তিক কর্মসূচির আন্দোলন ততো দ্রুত বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। এ আন্দোলন দমনে ১৯৬৮ সালে আইয়ুব সরকারের আগরতলা মামলার আশ্রয় গ্রহণ আরেক ধাপ জলন্ত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। ফলে আইয়ুব বিরোধী গণ আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৬৯ সনের গণ-অভ্যুত্থানে শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের বিজয় সূচিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে বিভিন্ন আন্দোলনে তারা সাহসী ভূমিকা পালন করতে পিছপা হয় নি।

গণ-অভ্যুত্থানের বিভিন্ন কারন সমূহ ঃ গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন, পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক আমলাদের সীমাহীন কর্তৃত্ব বিলোপ, পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিবাদমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরন, গণবিরোধী শক্তির মূলোৎপাটন এবং সর্বোপরি স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান সূচিত হয়। এর প্রধান প্রধান কারনগুলো হলো ঃ-

(১) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বৈষম্যই ছিল গণ-অভ্যুত্থানের মূল কারণ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রশাসনিক, চাকরী, ব্যাবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে দেখা দেয় চরম বৈষম্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করে রাখা হয়। ফলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভের দানা বেঁধে উঠে।

(২) আইয়ুব খান সার্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানে ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে ভোটাধিকার অর্পন করেন। এ আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে আইন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। তাছাড়াও এদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা উল্লেখযোগ্য। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীর দাপট ছিল অসামান্য। তারা অন্ধভাবে আইয়ুব মোনেম সরকারের দালালী করতেন। তাদের গণবিরোধী কার্যকলাপ জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে গণ-অভ্যুত্থানের পথ প্রসারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) আইয়ুব সরকারের শাসনামলে পাকিস্তানের রাজনীতিক ও প্রশাসনে আমলা-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনে আমলা ও সেনাবাহিনীর নগ্ন হস্তক্ষেপ জনগনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এটাও গণআন্দোলনের একটা কারন।

(৪) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম মূল দাবী ছিল স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা কিন্তু পাকিস্তানী শাসকচক্র প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে "শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন" প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে উঠে। ফলে পূর্বপাকিস্তানসহ সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর--পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জনগনও ১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

(৫) গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে সমগ্র পাকিস্তানের জনগন যখন সোচ্চার হতে থাকে তখন আইয়ুব সরকার তাদেরকে দমনের জন্য নৃশংস পুলিশী নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্যাতন যতই বাড়তে থাকে তাদের আন্দোলন ততই গভীর হতে থাকে। এভাবেই ক্রমেই গণ-অভ্যুত্থানের পথ অনেক প্রসারিত হয়।

(৬) জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার প্রসারও ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং ১৯৬৬ সালে ৬-দফা কর্মসূচী প্রকাশে আরো প্রানবন্ত হয়ে উঠে। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগন সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে ১৯৬৯ সালে সোচ্চার হয়ে উঠে। ফলে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারন করে।[১২]

আইয়ুব সরকারের পতন ঃ-

বাঙালীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী ৬-দফাকে নস্যাৎ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি দায়ের করেন। এ মামলাটি দায়ের করার ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুব বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠে। ১৯৬৬ সালে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের পর হতেই জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে উঠেন। ষাট দশকের পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না বললেই চলে কিন্তু আইয়ুব সরকারের আমলে সেখানে ভূমি সংস্কার ও দ্রুত শিল্পায়নের ফলে কৃষি, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং এর সঙ্গে সাধারণ মানুষ শিক্ষা ক্ষেত্রেও কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। এ শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আশা আকাঙ্খা পূরনের জন্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় তা পূরন হওয়া সম্ভব ছিলনা। ফলে সেখানেও একটি শ্রেণীর মধ্যে আইয়ুবী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয়।

এদিকে বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্দুর মানুষ পাঞ্জাবী আধিপত্য হতে মুক্তি লাভের জন্য এক ইউনিট বাতিল করার জোর দাবী জানায়। এ পরিস্থিতিকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ভুট্টো কাজে লাগান, এবং জনগনকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য সচেষ্ট হন।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করার জন্য ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রগণ আন্দোলন আরম্ভ করে। এতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষনের ফলে কিছু ছাত্র নিহত হয়। ফলে আন্দোলন আরও ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারন করে।

পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনকে পুর্ব পাকিস্তানী ছাত্রসমাজ স্বাগত জানায়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবীতে দেশে ধর্মঘট পালন করা হয়। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অতি তাড়াতাড়ি সমগ্র পুর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য তৎকালীন ডাকসু সহ সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে "ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" নামে এক সংগঠন গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী এ সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচী ঘোষণা করে।

১১ দফা দাবির মধ্যে শুধু ৬ দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের কথাই ছিল না এতে ছাত্র কৃষক শ্রমিক সকল শ্রেণীরমানুষের শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সে কারনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ডাকে দেশের আপামর জনসাধারণ ব্যাপকভাবে সাড়া প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে ১৯৬৯ সালের ৮ই জানুয়ারী ঢাকায় ৮টি বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করেন। এ ৮টি দলের মধ্যে ছিল, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), জামায়াত-ই ইসলামী, নেজাম-ই-ইসলাম, জামায়াতী উলাম-ই-ইসলাম ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এ দলগুলো ১৯৭০ সালের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা বাতিল করে প্রত্যক্ষ নির্বাচনসহ পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানীর ন্যাপ সরাসরি সংগ্রাম পরিষদে যোগ না দিলেও তিনি তাঁর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা ও বিবৃতির দ্বারা ছাত্র সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অনুপ্রানিত করেন। তিনি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমানকে মুক্তিদানের জন্য জোর দাবি জানান। এর ফলে এ আন্দোলন ব্যাপক গণ বিপ্লবে পরিণত হয়।

আইয়ুব সরকার এ আন্দোলনকে দমন করার জন্য অনেক রকম পন্থা অবলম্বন করেন। বলতে গেলে কোন পন্থাই বাদ রাখেন নি। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়তে থাকে জনগনের জঙ্গী মনোভাব ততই দৃঢ় হতে থাকে। ছাত্র আসাদুজ্জামান, অধ্যাপক শামসুজ্জোহা সহ অনেক নাম না জানা ছাত্র ও কর্মী পুলিশের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ, কার্ফ্যু নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় এবং সমস্ত দেশে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যার ফলে আইয়ুব সরকার ক্রমে গণশক্তির নিকট নতি স্বীকার করতে আরাম্ভ করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী আইয়ুব খান ইত্তেফাকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং সংবিধান সম্পর্কে আলোচনার জন্য গোল বৈঠকের প্রস্তাব দেন। আইয়ুব খান এটাও ঘোষণা করেন যে, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করনে না। কিন্তু কোন কিছুই জনগনকে শান্ত করতে পারে নি। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ ও ছাত্রনেতাগন অবিলম্বে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। আইয়ুব খান এ দাবিও মেনে নিতে বাধ্য হন এবং ২২শে ফেব্রুয়ারী অভিযুক্তদের বিনাশর্তে মুক্তি দান করেন। ২৩শে ফেব্রুযারী সদ্যমুক্ত শেখ মুজিব ও অন্যান্যাদেরকে এক গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এ সম্বর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র জনগন কর্তৃকঃ "বঙ্গবন্ধু" আখ্যায় ভূষিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান ঐ সম্বর্ধনা

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানে ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার জন্য ছাত্র-জনতা সবাইকে আহ্বান জানান এবং দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন।

এ সময় রাওয়ালপিন্ডিতে এক "গোল বৈঠক" অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আইয়ুব খান সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে সাংবিধানিক সংস্কার সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানও এ বৈঠকে যোগদান করেন। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ একমত হন। এবং আইয়ুব খান এ দাবি মেনে নেন। কিন্তু ৬ দফা ভিত্তিক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বীকৃত না হওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ বর্জন করে এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এদিকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাষানিও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন। ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। এ পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খান তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন। এভাবে আইয়ুব সরকারের পতন সংঘটিত হয়।[১৩]

পাকিস্তানের ২য় সামরিক শাসন জারি ঃ-

১৯৬৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী জেনারেল আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়াল পিন্ডিতে এক গোল বৈঠক অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান, সে বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমানও যোগদান করেন। আইয়ুব খান বিরোধী দলীয় বিভিন্ন মৌলিক দাবী মেনে নিলেও ৬ দফা ভিত্তিক দাবীটি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু ৬ - দফার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু অনড় অবস্থান করেন। ফলে গোলবৈঠক ব্যর্থ হয়। এদিকে সারাদেশে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং তা দিন দিন মারাত্মক রূপ ধারণ করে। অগত্যা আইয়ুব সরকার সামরিক শাসন জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করার কথা বললে সেনাবাহিনী অসম্মত জানায়। ফলে নিরুপায় হয়ে তিনি ২৪শে মার্চ এক পত্রে [১৪] পাকিস্তান সেনা বাহিনী প্রধান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রন জানান। পরের দিন ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতা গ্রহনের সাথে সাথে ইয়াহিয়া খান সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬২ সালের সংবিধান, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষনে তিনি জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের কাছের যথাশীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর থেকে বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ-

১। মাহমুদ শফিক ঃ- বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়। প্রকাশক বর্ণবীনা প্রকাশনী ৩৯/৩, পূর্ব হাজীপাড়া খিলগাঁও, ঢাকা *p.*-১৫

২। মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান তালুকদার, সোহরাওয়াদী স্মৃতিকথা *p.*-১৭৮ আবু আল সাঈদ, আওয়ামী লীগের ইতিহাস *p.p.*- ৯৯-১০০

৩। হারুন অর-রশিদ : বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০ প্রকাশক, নিউ এজ পাবলিকেশন্স ৬৫ প্যারিদীাস রোড ঢাকা-১০০০ *p.*-২১৬

৪। মোঃ মোজাম্মেল হক : বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রকাশক- হাসান বুক হাউস, ৬৫ প্যারীদাস রোড বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ *p.* ১৪৪-১৪৫

৫। মাহমুদ শফিক *Ibid p.p*- ১৫-১৬

৬। আবুল ফজল হক - বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রকাশক- টাউন স্টোর্স স্টেশন রোড রংপুর, ১৯৯৮ *p.*-৭৮

৭। কামরুদ্দীন আহমেদ "স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর - *p.*- ৬৭

৮। মাহমুদ শফিক : *Opcit p.* - ১৭

৯। মওদুদ আহমদ - বাংলাদেশ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা *p.* - ৭১

১০। আবুল ফজল হক *Ibid p.p.* ৮২-৮৩

১১। কামরুদ্দীন আহমেদ - *Ibid p.*- ৬৮

১২। মোঃ মোজাম্মেল হক *Ibid p.* - ১৮৭

১৩। আবুল ফজল হক : *Opcit* - *p.p.* ৮৬-৯০

১৪। পত্র দ্রষ্টব্য, স্বাধীনতা যুদ্ধ, দ্বিতীয় খন্ড *p.* ৪৪৬, অলি আহাদ জাতীয় রাজনীতি *p.* ৪৩০-৩৮

১৫। হারুন-অর-রশিদ - *Ibid p.p*- ২৭৭-২৭৮.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬ : ১৯৭০ সনের নির্বাচন ঃ-

৬.১ নির্বাচনের পটভূমি ও আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন ঃ-

৬ - দফা আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনাকে বিনষ্ট করার জন্য ১৯৬৮সালে আইয়ুব খান আওয়ামী লীগ তথা প্রগতিশীল বাঙালী জনগনের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে শুরু করে। প্রহসনমূলক ও মিথ্যা "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা" দায়ের করে শেখ মুজিবর রহমানকে কারগারে প্রেরন করা হলে বাঙালী জনগন গণ-আন্দোলন শুরু করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮-৬৯ এর গণ-আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ তদানীন্তন পাকিস্তানের জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করেন এবং দ্বিতয়বারের মত সামরিক শাসন জারি করেন।[১]

ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করার পর ২৮শে নভেম্বর ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করা হয় ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী হতে। ইয়াহিয়া খান ৩০শে মার্চ নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। ইতিমেধ্যে তিনি ১৯৭০ সালের ১লা মার্চ এক আদেশ বলে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে পূর্বতন প্রদেশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য আইনগত কাঠামো আদেশের জাতীয় পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। "এক ব্যক্তি, এক ভোট" এক নীতি অনুসরণ করে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হয়। ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় পরিষদে ৩০০টি সাধারণ আসন ও ১৩টি মহিলা আসনের ব্যবস্থা করা হয়। যেসব প্রদেশগুলোতে আসনগুলো বন্টন করা হয় সেগুলো হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি, পাঞ্জাব ৮৫টি, সিন্ধু ২৮টি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় অঞ্চল ২৬টি ও বেলুচিস্তান ৫টি।

এটা ব্যতীত, প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। এতে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে সাধারণ আসনে সদস্যগণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষ ভোটে এবং মহিলা সদস্যগন নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবে। এ আদেশে আরও বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর নিকট উপস্থাপিত করতে হবে এবং তিনি এটা অনুমোদন না করলে জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে যাবে। তাছাড়া সংবিধান প্রনয়নের জন্য জাতীয় পরিষদকে ১২০ দিন সময় দেয়া হবে। উক্ত সময় সীমার মধ্যে সংবিধান প্রনয়ন করতে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদের অবসান ঘটবে। কিন্তু জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে গেলে কে সংবিধান প্রণয়ন করবে সে সম্পর্কে এ আদেশে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদকে আইনগত কাঠামো আদেশ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করেনি, বরং চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই ন্যস্ত ছিল। ফলে প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এ আদেশের তীব্র সমালোচনা করেন এবং জাতীয় পরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদানের দাবী জানায়। এ পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, জনগণ কিংবা তার প্রতিনিধিদের ক্ষমতা খর্ব করার কোন ইচ্ছা তার নেই। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধান অনুমোদনের বিধান আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আইনগত কাঠামো আদেশে বর্ণিত সাধারণ নীতির ভিত্তিতে সংবিধান প্রনীত হলে তিনি অবশ্যই এটা অনুমোদন করবেন। শেষ পর্যন্ত সকল দলই নির্বাচন করতে রাজী হন। শেখ মুজিবুর রহমানের মতে ৬-দফার প্রতি জনগনের সমর্থন প্রমান করার জন্য আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহন করে।[২]

পূর্ব পাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যার কারনে ৫ই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরে ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদগুলোর জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু হয়। মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলো হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক আওয়ামী লীগ, পি,ডি,পি পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ ও ন্যাপ (ভাষানী), পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক পি.পি.পি ও জামিয়াত-ই-উলামা-ই-পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক জামায়াত-ই-ইসলামী, নেজাম-ই-ইসলাম, কাইউম মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও ন্যাপ (ওয়ালী)।

সাংবিধানিক প্রশাসনই এই নির্বাচনে প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। মূলত ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় পরিষদ এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রদেশসমূহের জন্য একটি আইন পরিষদ নির্বাচন করা। জাতীয় পরিষদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান রচনা করবে এবং সংবিধান প্রনয়নের পর এটা কেন্দ্রীয় আইনসভা রূপে কাজ করবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রদেশসমূহের জন্য জনগনের প্রতিনিধিত্ব থাকার যে জোর দাবী জানানো হয় ইয়াহিয়া খান তা মেনে নেন। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের পরিমান এবং রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান সম্পর্কে বিতর্ক থেকে যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় এ দুটি প্রশ্নই প্রাধান্য লাভ করে।

আওয়ামী লীগ ৬ দফা ও ১১-দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করে। স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে গণভোট বলে ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জনগনের উপর যে শোষণ চালয় আওয়ামী নেতৃবৃন্দ তার তীব্র সমালোচনা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬ - দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বাযত্বশাসনের দাবী জানান। আওয়ামী লীগ গনতান্ত্রিক পথে "সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। এমনকি নির্বাচনে বিজয়ী হলে ৬ - দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রনয়নের প্রতিশ্রুতিও আওয়ামী লীগ দেয়। তাছাড়া শ্রমিক-কৃষকের কল্যানের জন্য কিছু সংস্কারমূলক কর্মসূচীও ঘোষণা দেয়।

অপরদিকে মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, জামায়াত-ই-ইসলামী, নেজাম-ই-ইসলাম, পি.ডি.পি, প্রভৃতি ডানপন্থী ইসলামী দলগুলো শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতি ছিলেন। এরা ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে নিন্দা করেন। পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রশ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে গণভোট বলে ঘোষণা করেন।[৩] এসব ধর্মমনা ও উগ্রপন্থী (ডান) দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারনায় স্বায়ত্বশাসনের কথা না বললেও পূর্ব পাকিস্তানে আরও বেশী বিনিয়োগ এবং রাজস্ব ব্যয়ের দাবী জানায়।[৪]

মস্কোপন্থী ন্যাপ (ওয়ালী) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এবং ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানায়। চীনাপন্থী ন্যাপ (ভাষানী) ঘোষণা করেন যে, সামাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ। মাওলানা ভাষানী বলেন যে, সমাজতন্ত্রই একমাত্র মুক্তির পথ। মাওলানা ভাষানী বলেন যে, ৬-দফা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এবং এতে কৃষক শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কোন কথা নেই।[৫]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে ইসলামী দলসমূহ নির্বাচনী প্রচারনায় ইসলামকে একমাত্র ইস্যু হিসেবে উল্লেখ করে এবং তারা দাবী করে যে, একমাত্র ইসলামই পারে সকল

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার সমাধান করে দিতে। এরা আওয়ামী লীগ, ন্যাপ প্রভৃতি ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলোকে ইসলাম বিরোধী বলে নিন্দা করে। এরা নিজেরা পাকিস্তানকে একটি ইসলামী সংবিধান উপহার দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরা সমাজতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বলে ঘোষণা দেয় এবং সমাজতন্ত্রীদের ধর্মহীন নাস্তিক বলে কঠোর সমালোচনা করে।

অপর দিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর দলের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল "ইসলাম আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি।" পি.পি.পি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতি ছিল কিন্তু প্রকাশ্যে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের বিরোধীতা করেনি, মূলত এ দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করে।[৬]

অন্তহীন টালবাহানা আর গদি আঁকড়ে থাকার চক্রান্তের পর পাকিস্তানের প্রথম সাধারন নির্বাচন হবার কথা ছিল দেশটি স্বাধীন হবার ২৩ বছর পরে, ১৯৭০সালের ২০ নভেম্বর। কিন্তু ১২ই নভেম্বর নজিরবিহীন ঘুর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক বানে পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ মারা গিয়েছিল সে প্রলয়ে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ গোড়ায় ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা স্বীকার করতে চায়নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চীনে রাষ্ট্রীয় সফর করতে গেলেন ঢাকা হয়ে কিন্তু বিধ্বস্ত অঞ্চলে হাওয়াই সফর করার কথাও তার মনে হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের সকল মানুষতো বটেই, বহির্বিশ্বের মানুষও পাকিস্তান সরকারের এ অমানুষিক অবহেলায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ঘুর্ণিঝড়ের অজুহাত দেখিয়ে সাধারণ নির্বাচন আরও একবার স্থগিত করার কথা রাওয়ালপিন্ডিতে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল। কিন্তু দেশ বিদেশে প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত সে মতলব বাদ দেয়া হয়। তবু বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচন কয়দিন পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশেষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জন্য যুগপৎ নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর।[৭]

১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯% এবং সমগ্র পাকিস্তানে এটা ছিল ৫৭.৯৬%। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে। বাকী দুটির ১টি লাভ করেন পি.ডিপি'র নুরুল আমিন এবং অপরটি পান পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল ঃ-

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকার আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানে প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান				
আওয়ামী লীগ	১৬০	---	৭	---	১৬৭	৭৫.১১
পিপলস পার্টি	---	৮৩	৫	---	৮৮	---
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	---	৯	---	---	৯	১.০৭
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	---	৭	---	---	৭	১.৬০
ন্যাপ (ওয়ালী)	---	৬	১	---	৭	২.০৬
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	---	২	---	---	২	২.৮১
জামাত-ই-ইসলামী	---	৪	---	---	৪	৬.০৭
জামাত-ই-ইসলামী পাকিস্তান	---	৭	---	---	৭	২.৮৩
জামাত-ই-ওলামে ই-ইসলাম	---	৭	---	---	৭	০.৯২
পি.ডি.পি	১	---	---	---	১	২.৮১
স্বতন্ত্র / নির্দলীয়	১	৬	---	৭	১৪	৩.৪৭
অন্যান্য দল ঃ ন্যাপ (ভাসানী) পাকিস্তান জাতীয় লীগ, গণমুক্তি দল, ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ইসলামী গণতন্ত্রী দল	---	---	---	---	---	১.২৫
	১৬২				৩১৩	১০০

উৎস ঃ *Report on General Election, Pakistan (1970-71) Vol, 1, 1972*

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনী ফলাফল ঃ

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮	৭০.৪৫
পি.ডি.পি	২	---	২	১.৯৮
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	---	১	৩.২৭
জামাত-ই-ইসলামী	১	---	১	৪.৫০
নেজামে ইসলাম	১	---	১	১.৪৮
স্বতন্ত্র বা নির্দল	৭	---	৭	১০.৭৬
পরাজিত দল সমূহ	---	---	---	৭.৫৬
	৩০০	১০	সর্বমোট - ৩১০	১০০

উৎস ঃ *Report on General Election, Pakistan (1970-71) Vol, 1, 1972*

উপরোক্ত সারণীগুলোতে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে যেরকম নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্টতা অর্জন করেছিল তেমনি পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় মহিলাদের সংরক্ষিত আসনসহ মোট ২৯৮টি আসন।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা ৯৮.৭% টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১% ভাগ ভোট লাভ করে। অপর পক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পি.পি.পি জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তান অংশের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এ নির্বাচনের ফলাফলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষনীয় দিক হল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট দল আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোন আসন পায়নি, ঠিক তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যগরিষ্ট দল পি.পি.পি ও পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন পায় নি। এ নির্বাচনের ফলাফলে তাই জাতীয়তার এবং আঞ্চলিকতার উগ্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানের আওযামী লীগের মনোনীত ৮ জন প্রার্থীই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং পি.পি.পির জনসমর্থন না থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে কোন প্রার্থীই দাঁড় করায়নি।৮

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫% ভোট এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০% ভোট লাভ করে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক নূতন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। এ বিপুল বিজয় পরিষ্কারভাবে প্রমান করে যে, বাঙালী জাতি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং ৬ - দফার ভিত্তিতে তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে তারা সংকল্পবদ্ধ জাতি।

৬.২ - ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পুর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তানী সামরিক হস্ত ক্ষেপ ও নির্যাতন ঃ-

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সারা পাকিস্তানের মধ্যে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রন জানানো হচ্ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে কিছুতেই সরকার প্রধান হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এ বাহিনী নিজেদের দেশের "এলিট" শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা হিসেব করে নিয়েছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় বসলে বিভিন্ন সুবিধাদি থেকে তারা বঞ্চিত হবে। কেননা শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাজেট হ্রাস করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। যেহেতু পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৮টি আসন লাভ করেছিল। তাই তিনি হঠাৎ দাবী করেন যে, শেখ মুজিব যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্টতা পেয়েছেন তাই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নেতা, আর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্টতা পেয়েছেন তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিবেন। তখন আর কারোই বুঝতে অসুবিধা রইল না যে, পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে সেনাবাহিনী এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো হাত

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়েছেন। একই সঙ্গে "পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বাস্তবতা" প্রতিরক্ষার বিবেচনা ইত্যাদি কতগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ঘন ঘন উচ্চারিত হতে থাকে। একাত্তর সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে। সেখানে বেশ গরম গরম আলোচনা হয়। সেখানে আলোচিত হয় যে, যদি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের বৈঠক ডাকা না হয় তা হলে আওয়ামী লীগ বিশেষ পথ বেছে নিবে। এ বৈঠকের দিন দুই পরে ঘোষণা করা হয় যে, ঢাকায় ৩রা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।[৯] কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ "আদান প্রদানের" মনোভাব গ্রহন না করলে এবং ৬ - দফা কর্মসূচীর রদবদল" না করলে পিপলস পার্টি ৩রা মার্চের অধিবেশনে যোগ দিবেনা। তিনি অভিযোগ করেন যে, ৬ - দফার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ সংবিধান রচনা করেছে এবং এটা কেবল "অনুমোদন" করার জন্য তাঁর দল ঢাকায় যেতে পারে না। তিনি ঢাকায় আহুত জাতীয় পরিষদকে "কসাইখানা" বলে অভিহিত করেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদিগকে এতে যোগদান না করার জন্য হুশিয়ারী প্রদান করেন। কিন্তু ভুট্টোর হুশিয়ার সত্বেও পিপলস পার্টির সদস্যগন ও কাইয়ুম মুসলিম লীগের সদস্যগন ব্যতীত অন্যান্য দলের সদস্যগন জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং অনেকেই ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। এরকম অবস্থায় ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

অগনতান্ত্রিক ভাবে এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ ছাত্র শ্রমিক-ব্যবসায়ী তাদের স্বাভাবিক কার্যকলাপ বন্ধ রেখে রাস্তায় নেমে পড়েন। এবং বিভিন্ন শ্লোগানে শ্লোগানে ঢাকার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলেন। ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়।

এ দুদিন কার্ফু দেওয়া হয়। এ কার্ফু ভঙ্গ করার জন্য গুলী চালান হয় এবং এতে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। সে সভায় শেখ মুজিবুর রহমান স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের ডাক দেন এবং জনসাধারনকে অফিস আদালত, কল কারখানা, এবং খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ রাখতে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রচন্ড গণবিস্ফোরনের মুখে ইয়াহিয়া খান তার কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি ৬ই মার্চে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে ২৫শে মার্চ। তিনি ইতিপূর্বে সংসদীয় দলগুলোর এক নেতৃ সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে তিনি ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন এবং উক্ত জনসভায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উক্ত জনসভায় তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা, হত্যা তদন্ত করা, আর জনগনের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ইত্যাদি দাবীগুলো জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন দাবীগুলো মেনে না নিলে পরিষদের বৈঠকে বসার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তিনি কোর্ট কাছারি, শিল্প, কল কারখানা, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন এবং খাজনা ট্যাক্স দেওয়া থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। তিনি গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান এবং যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুর মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[১০]

৭ই মার্চের এ আহ্বানের ফলে অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করে। চারিদিকে শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠে। কলকারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মূলত তখন দেশ চলতে থাকে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে।

এরই মাঝে ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ই মার্চ থেকে ঢাকায় শুরু হয় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। পরবর্তীতে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও পশ্চিম পাকিস্তানী শীর্ষ নেতারাও এ বৈঠকে যোগ দেন। আলোচনার পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলনও চলতে থাকে। ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো একদিকে সংকট নিরসনের নামে আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে থাকে, অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বপাকিস্তানে সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম গোপনে আনার কাজটি সম্পন্ন করেন। ইয়াহিয়া ভুট্টোর গোপনে শলাপরামর্শ ও সন্দেহজনক গতিবিধি ঢাকা শহরকে উত্তপ্ত করে

Dhaka University Institutional Repository

তোলে। এ বৈঠক ছিল কালক্ষেপন মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী ও সামরিক সাজ সরঞ্জামাদি এসে পৌঁছার পর পরই কোন ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকা ত্যাগ করেন। এবং ঢাকা ত্যাগের পূর্বে ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানোর নির্দেশ প্রদান করে যান।

২৫শে মার্চের রাত্রে সমস্ত হিংস্রতা ও নারকীয় তান্ডবলীলা নিয়ে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। তাদের প্রথম আক্রমন শুরু হয় ঢাকা মহানগরীকে দিয়ে। আক্রমনের অন্যতম শিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপ্রিয় ও নিবেদিত প্রান শিক্ষকরাও এ আক্রমন থেকে রেহাই পায়নি। বিভিন্ন হলগুলোতে আক্রমন চালিয়ে বহু সংখ্যক ছাত্রকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে। হাজার হাজার নিরীহ শ্রমিক-বস্তিবাসীকে তারা ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। পাকবাহিনীর অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু রাজারবাগ পুলিশ লাইন। এখানে পাকবাহিনীকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে তারা ট্যাঙ্কবাহিনীও ব্যবহার করে। পিলখানা ই.পি.আর (বর্তমান বি.ডি.আর) বাহিনীর উপরও তারা আক্রমন পরিচালনা করে। যারা পালাতে সক্ষম হয়নি তারা পাক সেনাদের হাতে প্রান দেয়। একই সময় একই কায়দায় পাকিস্তানী জল্লাদবাহিনী আক্রমনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন এলাকায় আগুন ধরিয়ে মানুষের সর্বস্ব জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এভাবে ২৫শে মার্চের অতর্কিত হামলায় প্রায়, ৫০,০০০ হাজার নর-নারীকে পাকবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। ইত্তেফাক অফিস ও নিউনেশন প্রেসকে কামানের গোলায় ধুলিসাৎ করা হয়। মূলতঃ ২৫শে মার্চ বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে একটি কালো রাত্রি।

২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীদের অতর্কিত হামলার কিছুপর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন।[১১]

৬.৩ : আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বন্দী ও পূর্বপাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঃ-

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব যে ছয় দফা পেশ করেছিলেন তার মূল ভিত্তি ছিল সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকার। ১৯৭০ সালের সাধারণ পরিষদের নির্বাচন সে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও শেখ মুজিবর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে নানারকম অজুহাত দেখানো হয়। পরিশেষে বাঙালী জাতির স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী শুরু করে পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর নারকীয় গণহত্যা, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে শুরু হয় তাদের এ হত্যালীলা [১২] ২৫শে মার্চের মধ্যরাতের কিছুপর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঢাকায় দলীয় নেতৃবৃন্দ ও চট্টগ্রামে ওয়্যারলেসে বিভিন্ন সহকর্মীদের নিকট একটি বার্তা পৌঁছে দেন এবং তা সারাদেশে প্রচারের নির্দেশ প্রদান করেন। বার্তাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

"বাঙালী ভাই বোনদের কাছে এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমার আবেদন-রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প ও পিলখানা ই.পি.আর ক্যাম্পে রাত ১২টায় পাকিস্তানী সৈন্যেরা অতর্কিত হামলা চালাইয়া হাজার হাজার লোককে হত্যা করিয়াছে। হানাদার পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে আমরা লড়িয়া যাইতেছি। আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তাহা পৃথিবীর যেকোন স্থানেই থাকিয়া হউক। এমতাবস্থায় আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি দিয়া মাতৃভূমিকে রক্ষা কর। আল্লাহ তোমাদের সহায় হউন - শেখ মুজিবর রহমান।"

বঙ্গবন্ধুর এ বার্তা পেয়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম, এ, হান্নান ২৬শে মার্চ বেলা ২টার সময় চট্টগ্রামের কালুরঘাটে স্থানান্তরিত স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্র থেকে, মেজর জিয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আবুল কাশেম সন্দ্বীপসহ আরো কয়েকজন স্বাধীনতার ঘোষনা বার বার প্রচার করেন। ২৫শে মার্চের রাতে বাঙালীদের উপর নির্যাতন এবং মধ্য রাতের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া পর পরই সারাদেশে শুরু হয় প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। অপরদিকে স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তার ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা ঃ

২৫শে মার্চ বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক কাল ৩মাসাচ্ছন্ন দিন। ২৫শে মার্চের রাতের অতর্কিত হামলার পর পরই ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে সারাদেশে শুরু হয় প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ১৭ই এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার। প্রবাসী সরকার ১৫ই মে থেকে মুক্তিবাহিনী গঠন শুরু করে। সিলেটের তেলিপাড়া নামক স্থান থেকে একত্রিত হয়ে কর্নেল ওসমানী, মেজর শফিউল্লাহ এবং মেজর খালেদ মোশারফ এক পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী মুক্তিবাহিনীকে ১১ সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি আর একটি স্বতন্ত্র বাহিনী গড়ে উঠে। সেটি হচ্ছে মুজিব বাহিনী যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং সিরাজুল আলম খান। আরও একটি বাহিনীও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে, সেটি হচ্ছে কাদেরিয়া বাহিনী যার নেতৃত্বে ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। তাছাড়া সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে "সর্বহারা" গ্রুপ নামে একটি গ্রুপও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে।

অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Bangladesh Revolution and Its after math*-এ মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি বাহিনীর তিনটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) একটি বৃহৎ গেরিলা বাহিনী গঠন করা ও তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তারা হানাদার বাহিনীকে নিঃশেষ করবে এবং তারা যাতে সুসংগঠিত হতে না পারে সেজন্য যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন করবে। তারা পাকিস্তানী সামরিক পোস্ট বা লরীসমূহের বিরুদ্ধে *Hit and Run* কার্যকলাপে নিয়োজিত থাকবে, যা পাক বাহিনীর মধ্যে স্থানীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করবে।

(২) মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ইউনিটকে বৃদ্ধি বা প্রসারিত করে গেরিলা বাহিনীর সহায়তার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সেক্টর সমূহে মোতায়েন করা।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র মুক্তিবাহিনীর নিয়মিত ইউনিটকে দেয়া এবং পাকিস্তানী বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানার লক্ষ্যে গঠিত বাহিনীর জন্য গেরিলারা লোক সংগ্রহ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

হানাদার বাহিনীর লজিস্টিক সাপোর্ট লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিবে।

ইতিহাসে দেখা যায়, গেরিলা যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান বিস্তীর্ন অঞ্চল। সেক্ষেত্রে ৰাংলাদেশের ভৌগলিক পরিবেশ গেরিলা যুদ্ধের জন্য মোটেও উপযোগী ছিল না। তাই দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গেরিলাদেরকে তিনটি পর্যায়ে তিনটি কৌশল গ্রহন করতে হয়।

প্রথম পর্যায় ছিল আত্মরক্ষামূলক ঃ

মুক্তি সংগ্রামের প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে ২৫শে মার্চ ও মে মাসের মাঝামাঝি সময়টাকে। এ সময় গেরিলারা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। পাকিস্তানী পাক বাহিনীরা যখন ২৫শে মার্চের রাতে ই.পি.আর রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে শুরু করে তখন বাঙালী সদস্যগন পিছু হটতে থাকে। এর কারন ছিল আত্মরক্ষামূলক এবং অসংখ্য বিপদগ্রস্ত বাঙালীদের জীবন রক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। এ অবস্থায় পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হতে পারে নি বিধায় তারা পুরোদমে যুদ্ধে অংশগ্রহন করতে পারেনি। এ সময় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.পি.আর-এর অফিসাররা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করে একের পর এক শহর দখল করতে থাকে। আকাশ ও স্থল পথে তাদের নিয়ন্ত্রন থাকার দরুন মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই প্রধান প্রধান শহর তাদের দখলে চলে যায়। এসকল শহরে তারা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এমনকি বেসামরিক জানমালের উপরও তারা নির্মমভাবে আক্রমন চালায়।

দ্বিতীয় পর্যায় ছিল মানসিক প্রস্তুতির কাল ঃ-

মে মাসের মধ্যবর্তী সময় থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ পর্যায়। সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারীরা গোপনে পলায়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখে। এ পর্যায়ে নেতৃত্বের দুটি

Dhaka University Institutional Repository

পর্যায় আবির্ভূত হয়। একটি হল উর্ধ্বতন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও সরকারী কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত এবং অপর পর্যায় উর্ধ্বতন সামরিক অফিসার ই.পি.আর এবং ছাত্র-যুবক-শ্রমিকদের সমন্বয়ে গঠিত যেটা সাধারণভাবে মুক্তিবাহিনী নামে পরিচিতি ছিল। বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে গেরিলারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থানায় থানায় ব্যাপক হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধের এ পর্যাযে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার জন্য শান্তি কমিটি গঠন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিহত করার জন্য রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ প্রভৃতি বাহিনীর হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। গেরিলাদের প্রচন্ড আক্রমনের মুখে অনেক রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অস্ত্র তুলে ধরেন। বলা বাহুল্য জামাত, মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটির উপর পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল। এক পর্যায়ে গেরিলারা পাট ও চা শিল্পের উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে, যাতে পাকিস্তান বাহিনীর বৈদেশিক মুদ্রা হ্রাস পায়। প্রবাসী সরকার কলকাতায় অবস্থান করে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায় এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য জোর কুটনৈতিক তৎপরতা চালায়। কলকাতা থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গেরিলা তৎপরতায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। এবং কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে গেরিলাদেরকে বিভিন্ন সংকেত প্রেরন করে উৎসাহিত করা হত। যদিও যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল খুবই ধৈর্য্যের তথাপি এ সময়েই জনগন দীর্ঘকালীন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহন করে।

তৃতীয় পর্যায় ছিল গেরিলাদের তৎপরতা ঃ-

মুক্তিযুদ্ধের এ পর্যায়ে প্রচন্ডভাবে গেরিলা তৎপরতায় রূপ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের তৃতীয় পর্যায় হিসেবে ধরা হয় অক্টোবর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর এ সময়কে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে গেরিলারা মাতৃভূমির মুক্তির শপথকে আঁকড়ে ধরে পাক বাহিনীর উপর প্রচন্ডভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নভেম্বরের শেষের দিকে তারা তাদের অবস্থানকে আরও শক্ত করে। এ সময় তারা পাক বাহিনীদের দখলকৃত এলাকাগুলোর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং বিদ্যুৎ অচল করে দেয়। এ সময় ঢাকা শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রায় ৩০ হাজার গেরিলা অবস্থান নেয়। গ্রামাঞ্চলেও গেরিলা তৎপরতা জোরদার

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়। মুক্ত অঞ্চল থেকে গেরিলারা কমান্ডো হামলা চালাত এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিত। এক পর্যায়ে ২৫শে মার্চ থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫,০০০ পাক সেনাবাহিনীকে হত্যা করা হয়। এবং ৫/৬ শত সেনাসহ বহু রাজাকারকে বন্দী করা হয়। গেরিলারা মার্কিন তথ্য কেন্দ্র বোমা মেরে উড়িয়ে দেয় এবং সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা সড়ক, ব্রিজ এবং রেল লাইন তুলে ফেলে এবং চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে প্রায় ২০টির মতো জাহাজ ডুবিয়ে দেয় যাতে বন্দর দুটি বন্দের উপক্রম হয়। এ পরিস্থিতিতে পাক সেনাদের তৎপরতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। গেরিলা বাহিনীর হামলার মুখে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। এবং এক পর্যায়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

অবশেষে বলা যায়, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গেরিলা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তা অবশেষে সফলতা পায়। দেশের জনগন স্বতঃস্ফুর্তভাবে সুসংগঠিত হয়ে গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করে। তাদের মনোবল ছিল ইস্পাত কঠিন। দেশের সর্ব শ্রেণীর জনগন গেরিলাদের সমর্থন দেয়। সুসংগঠিত পাক বাহিনীর সঙ্গে অসম সংগ্রামে বাংলার দামাল ছেলেরা সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং সব রকমের বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে জন্মভূমিকে মুক্ত করার জন্য যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তা অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে এসে সফলতা পায়।[১৪]

৬.৪ : পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পন ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম ঃ-

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর শেখ মুজিব পরিনত হন পাকিস্তানের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিত্ব রূপে। আওয়ামী লীগের এ বিজয় ইয়াহিয়া খানকে শঙ্কিত করে তোলে। যেহেতু ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান, সেহেতু বাঙালীদের হয়ে সঠিক পরামর্শ দেবার লোক তার ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পর ভূট্টো পাঞ্জাব এবং সিন্দুকে তার ক্ষমতার দূর্গ হিসেবে ঘোষণা করেন। এ পরিস্থিতিতে ভুট্টোকে বাদ দিয়ে ইয়াহিয়া খানের কিছুই করার ছিলনা। পাকিস্তানের যেসব ক্ষমতাধর ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফলে আশাবাদী ছিলেন, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় এবং ভুট্টোর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নও ভেঙ্গে যায়। তবে এ অবস্থায় সবচেয়ে সংকটে পড়েন ইয়াহিয়া খান। রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এবং ভুট্টোর সাথে সমঝোতা করার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। কারন ভুট্টো ছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানের এমন একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তি যার সাথে সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। এ অবস্থায় শেখ মুজিব ধীর গতিতে পদক্ষেপ নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছিল। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের অমানুষিক নির্যাতন চূড়ান্ত রূপ ধারন করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল। ছাত্রদের আন্দোলন সবচেয়ে বেশী তীব্র আকার ধারন করেছিল। তাছাড়া এ কয় বছরে ৬ -দফা আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছিল। যার কারনে শেখ মুজিবকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। শেখ মুজিবর রহমানের একটি দুর্বলতা ছিল তার পক্ষে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সমর্থন ছিল কম।[১৫] এ অবস্থায় জনগনের সমর্থনই ছিল শেখ মুজিবর রহমানের একমাত্র ক্ষমতার উৎস। অপর দিকে ভূট্টোর পক্ষে ছিল সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের সমর্থন। যদিও ইয়াহিয়া খানও ছিলেন মুজিব বিরোধী কিন্তু তা সহসা প্রকাশ্যে রূপ নেয়নি। এক দিকে ভূট্টো জনগনের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। অপর দিকে শেখ মুজিবকে জনগনের চাপে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী নির্বাচন পর্ব শেষ হবার পর জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নেতৃবৃন্দ ৬-দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা ও প্রয়োগে একনিষ্ট ও বিশ্বস্ত থাকার শপথ নেন।[১৬]

এ শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর জনগন স্বায়ত্বশাসনের ব্যাপারে আস্থা অর্জন করে। অপর দিকে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কম্পিত হয়ে উঠেন। ছয় দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে মুজিব ও ভূট্টোর মাঝে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। ভুট্টো চেয়েছিলেন একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করে অখন্ড পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নিতে, যাতে সেনাবাহিনীর একাংশেরও সমর্থন ছিল। অপর দিকে শেখ মুজিব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসন অর্জনের ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আস্থাশীল ছিলেন। এ তীব্র বিরোধের পাশাপাশি ইয়াহিয়া খান একটি গণহত্যা কর্মসূচী হাতে নেন। যাতে অনেক নিরীহ জনগণ হতাহত হয়। চারিদিকে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হয়। নির্বাচনের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো সংসদ অধিবেশনে বসার ব্যাপারে গড়িমসি আরম্ভ করেন। আওয়ামী লীগের সাথে তিনদিনের

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা শেষে তিনি ১৯৭১ সালের ৩০শে জানুয়ারী বলেন, "আমাদের অনেক মৌলিক সমস্যা রয়েছে এবং এসব সমস্যার উপর মতামত ব্যক্ত করতে কমপক্ষে ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ পর্যন্ত সময় লাগবে।"[১৭]

১৯৭১ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকা জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসবে বলে ঘোষণা দেন। কিন্তু ভুট্টো এ অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এমন অবস্থায় ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ তারিখে অধিবেশন স্থগিত বলে ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশ প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেশের সমগ্র স্বাভাবিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়ে সর্বশ্রেণীর জনগন ঢাকার রাস্তায় নেমে পড়ে। "তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ" "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর" প্রভৃতি শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখর হয়ে উঠে। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সে জনসভায় শেখ মুজিবর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এবং দেশের সকল শিল্প কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত এবং খাজনা ট্যাক্স দেয়া থেকে বিরত থাকতে জনগনকে আহ্বান জানান। এমন পরিস্থিতিতে প্রচন্ড গনবিস্ফোরনের মুখে ইয়াহিয়া খান ৬ই মার্চ ঘোষণা করেন ২৫শে মার্চ জাতীয় অধিবেশন বসবে। তিনি সংসদীয় দলকে নিয়ে একটি নেতৃ সম্মেলন ডাকারও প্রস্ত াব দেন। কিন্তু শেখ মুজিবর রহমান সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ময়দানে জাতীর উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উক্ত ভাষনে তিনি আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের মানুষ তাদের নেতার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে আরম্ভ করে সাধারণ পিয়ন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বতঃস্ফুর্তভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেন এবং তাদের এ সার্বিক অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ইয়াহিয়া খানের সরকার সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু হয়ে পড়ে। এ রূপ সফল অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ই মার্চ থেকে তিনি শেখ মুজিব ও অন্যান্য নেতাদের সাথে বৈঠক করে সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আলাপ আলোচনা চালাতে থাকেন। আসলে তার গোটা আলোচনা পর্বটাই ছিল ছলনা। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিল আলাপ আলোচনার আড়ালে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহন করা। তাই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কোন ঘোষণা ছাড়াই তিনি ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। এবং তার পূর্ববর্তী নির্দেশনায় সেনাবাহিনী অতর্কিতে নিরীহ জনগনের উপর আক্রমন চালায়। এই বর্বরবাহিনী একই সাথে ই.পি.আর ও পুলিশ ছাউনি, ছাত্রাবাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, শ্রমিক কলোনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ও বিভিন্ন বস্তিতে আক্রমন চালায় এবং হাজার হাজার বাঙালী নর নারীকে হত্যা করে। এ হত্যাকান্ড আরম্ভ হওয়ার কিছু সময় পরই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরন করা হয়। মূলত তখন থেকেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২৬শে মার্চ স্বাধিনতার ঘোষণা প্রচারিত হয় চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের নির্দেশে। শুরু হয় দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় ছিল প্রতিরোধ। প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে হানাদার বাহিনী গনহত্যা, লুন্ঠন, নারী নির্যাতনের বিভীষিকা সৃষ্টি করে। গ্রামের পর গ্রাম তারা জালিয়ে দিতে থাকে। ছাত্র যুবক দেখা মাত্রই তারা গুলি করে হত্যা করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হলে প্রতিরোধ সংগ্রাম স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয়। বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চলগুলোতে বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য "সেক্টর" গড়ে তোলা হয়। মোট ১১টি সেক্টর গড়ে তুলেছিল। সেক্টর কমান্ডারদের মাধ্যমে হাজার হাজার ছাত্র যুবক শ্রেণীকে ট্রেনিং দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দক্ষ করে তোলা হয়।

কর্ণেল ওসমানীর নেতৃত্বে মেজর জিয়া, মেজর শফিউল্লাহ, মেজর তাহের, মেজর জলিল, মেজর খালেদ মোশারফ প্রমূখ সেনা অফিসারের তত্ত্বাবধানে সদ্য ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা পদ্ধতিতে পাকবাহিনীর উপর পাল্টা আক্রমন চালাতে থাকে। সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে জনসমর্থনহীন পাকবাহিনীকে চোরাগুপ্ত আক্রমন চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দিশেহারা করে তোলে। ফলে পাক বাহিনী নিরীহ জনগনের উপর তাদের প্রতিহিংসা আরো বাড়িয়ে তোলে। সমগ্র বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার নেশায় তারা পাগল হয়ে উঠে। ফলে প্রায় ৯৩ লক্ষ মানুষ সহায় সম্বলহীন হয়ে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়। লক্ষ লক্ষ কিশোর যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বাংলাদেশের ভিতরে এবং ঢাকা শহরেই শুরু হয় গেরিলা অপারেশন। কলকাতায় অবস্থিত স্বাধীন বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

বেতার কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে আরো উদ্দীপ্ত করে তোলে।

এ সময় কিছু কিছু কুখ্যাত বাঙালীর সহায়তায় পাকবাহিনীর সমর্থনে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী গড়ে উঠে। এদের সীমাহীন অত্যাচারে বহু নিরীহ মানুষ প্রান হারায়, অনেক মা বোনের ইজ্জত নষ্ট হয়। শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, ডাক্তারকে এ বেঈমান বাহিনী ধরে নিয়ে যায় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে। এসব হত্যাকান্ডে বাঙালী জনগন আরও মারমূখী হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধারাও এসব দালালদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। গেরিলারা আইয়ুব খানের বহু কুকর্মের দোসর মোনায়েম খানকে তার বাসভবনে হত্যা করে। শুধু যুদ্ধ পরিচালনাই নয় নিরীহ জনগনকে বাঁচাতেও মুক্তিযোদ্ধারা সাহসী ভূমিকা পালন করে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বাঙালী জনগনের আস্থা আরও দৃঢ় হতে থাকে। ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা গুলো দখল করতে শুরু করে। এবং পাক বাহিনীদেরকে বিভিন্ন দখলকৃত অঞ্চল থেকে হটাতে বাধ্য করে।

১৯৭১-এর নভেম্বরের দিকে সংগ্রাম দ্রুতগতিতে পাকবাহিনীর নাগালের বাইরে চলে যায়। পাকবাহিনী নিদারুনভাবে কোন ঠাসা হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে মিলিটারি গভর্ণর টিক্কা খানের বদলে বাঙালী বেসামরিক রাজনীতিবিদ ডাঃ মালিককে গভর্ণর করে বেসামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করেও অবস্থার কোন পরিবর্তন আনয়ন করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পাকবাহিনীর দালাল রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর খুনীরা মুক্তিবাহিনী ও স্থানীয় জনগনের তীব্র আঘাতের সম্মূখীন হচ্ছিল। অবশেষে পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা গ্রামগঞ্জ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় আত্মরক্ষার পথ খুঁজতে থাকে। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল মুক্ত অঞ্চলে পরিণত হতে থাকে। এ রকম অবস্থায় জেনারেল ইয়াহিয়া মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার মানসে ভারতের বিরুদ্ধে ৩রা ডিসেম্বর বিমান হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধকে পাক ভারত যুদ্ধে পরিণত করে আন্তর্জাতিক সমর্থন ও ফায়দা লুটার চক্রান্ত করে। কিন্তু সে চক্রান্ত সফল হয়নি। জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে যুদ্ধ থামানোর প্রচেষ্টা আমেরিকার সহায়তা সত্বেও কার্যকর হয়নি। সোভিয়েত রাশিয়া "ভেটো" প্রয়োগ করে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। ৬ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দিরাগান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ফলে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথ কমান্ড। জল স্থল ও আকাশ পথে যৌথ বাহিনীর আক্রমন তীব্র হতে থাকে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহায়তায় স্থল বাহিনীর আক্রমন প্রচন্ড বেগে পলায়নপর পাকবাহিনীকে ধাওয়া করতে থাকে।

বিমান বাহিনীর সহায়তার অভাবে পাকবাহিনী দারুনভাবে অসহায় ও কোনঠাসা হয়ে পড়ে। মাত্র ১৩ দিনের মাথায় পাকবাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। যৌথ বাহিনীর কমান্ডার পাকবাহিনীকে আত্মসমর্পন করে নিজেদেরকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানান এবং অযথা নিরাপরাধ নিরীহ জানমালের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানান। যার ফলশ্রুতিতে বাধ্য হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় রেসকোর্স ময়দানে পাকবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডো সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ নিয়াজী ৯০ হাজার অফিসার ও জোয়ানদের নিয়ে ভারতীয় ইস্টার্ন বাহিনীর ও যৌথ কমান্ডের কমান্ডার লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পন করে। আত্মসমর্পন দলিলে স্বাক্ষর করেন লেঃ জেঃ নিয়াজী ও বিজয়ী সেনানায়ক লেঃ জেঃ জগজিৎ সিং অরোরা। মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খোন্দকার এবং মুক্তিযুদ্ধের বীর নায়ক কাদের সিদ্দিকী। স্বাধীন বাংলাদেশ শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পায়। অবশেষে বাঙালী জাতি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় সীমাহীন রক্তপাত ও ত্যাগের মাধ্যমে সর্বোপরি বিশ্ব জনমতের ও বন্ধু রাষ্ট্রের সরকার সমূহের সহায়তায় মাত্র ৯ মাসের মধ্যে একটি পরাক্রমশালী আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়। এবং একটি স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একটি অসম্ভবকে সম্ভব করা হলো। এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বাঙালী জাতি যে ত্যাগ স্বীকার করে তা ছিল ইতিহাসে বিরল। লক্ষ লক্ষ প্রানের তাজা রক্তের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল। প্রাণ দিতে হয়েছে দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী ও অনেক গুণী ব্যক্তিকে, তবু জাতি পরাধীনতাকে মেনে নেয় নি, মেনে নেয়নি অগনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে। কোন অন্যায় আবদারের সাথে আপোস করেনি। হাসিমুখে হাজারো বিপদ মোকাবিলা করে এবং অমানুসিক অত্যাচার সহ্য করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এ স্বাধীনতা।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ অভ্যুদয় হঠাৎ করে ঘটেনি বরং এর পিছনে রয়েছে অনেকগুলো ঐতিহাসিক কারণ। বস্তুতঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির বীজ নিহিত হয়েছিল বলা চলে। পাকিস্তান সৃষ্টির গোঁড়া থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশ পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ নির্যাতন চালাতো। তারা কখনও পূর্ব পাকিস্তানীদের দাবী দাওয়ার প্রতি সমর্থন দান করেনি। সংবিধানে দেশের উভয় অংশের মধ্যে সংখ্যা সাম্যনীতি গৃহীত হলেও তা কোনও দিন বাস্তবায়িত হয়নি। ভৌগলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই উভয় অংশের মধ্যে দ্বন্ধ দেখা দেয়।

ভৌগোলিক কারন ঃ

ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম এ দুটি অংশের মধ্যে ছিল হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান। এ দু অংশের মাঝখানে ভারত অবস্থান করে। এ দু- অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ধর্মের বন্ধন ছিল। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার, প্রথা, খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে দু অংশের মধ্যে বৈষম্য ছিল প্রকট। ভূ প্রাকৃতিক দিক থেকে পূর্বাঞ্চল পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। পূর্ব পাকিস্তান সমতল ভূমির সমন্বয়ে এবং পশ্চিম পাকিস্তান পার্বত্য ভূমির সমন্বয়ে গঠিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান প্রধানতঃ নাতিশীতোষ্ণ এবং পশ্চিম পাকিস্তান প্রধানতঃ বৃষ্টিপাতহীন মরু অঞ্চল। ভৌগলিক দিক থেকে বিচার করলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পেছনে এটাও একটি মূল কারন।

রাজনৈতিক কারণ ঃ-

প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে অপর একটি রাষ্ট্রের উপস্থিতি একে রাজনৈতিক দিক থেকে অনেকটা দুর্বল করে দেয়। এ পরিস্থিতিতে উভয় অংশের সবচেয়ে আগে প্রয়োজন ছিল উভয় অংশের মধ্যে সদ্ভাব ও

Dhaka University Institutional Repository

সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা যায়। এ অবস্থা বিবেচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পাকিস্তানে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা ভাবনা করেন। প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্টার ব্যাপারে কোন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়নি। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে খুঁটিনাটি নিয়ে উভয় অংশের মধ্যে দারুন মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। জনসংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় শাসনকার্যে এর সিংহ ভাগ দাবী করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা কেবল সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয়গন-পরিষদের সুপারিশ ক্রমে ১৯৫৬ সালে প্রথম সংবিধান রচিত করে। কিন্তু এ সংবিধানে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগনের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটে নি। এতে সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং মাত্র দু' বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানে তাদের আধিপাত্য বিস্তার করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।

সামরিক শাসন অবসানের পর আইয়ুব সরকার ১৯৬২ সালে দ্বিতীয় বারের মত সংবিধান প্রনয়ন করেন। এ সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু আইয়ুব খানও পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের দাবীদাওয়া পূরণ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান সংঘঠিত হয়। আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান এর পরপরই সামরিক শাসন জারি করেন। ইয়াহিয়া খানের শাসনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এবং পূর্ব পাকিস্তানি জনগনের আস্থা পশ্চিম পাকিস্তানীদের উপর থেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলে। যার ফলশ্রুতিতে বাঙালী জাতির একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

সামাজিক কারন ঃ ১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাষা সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষার প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। রাষ্ট্রভাষা নিয়েই সর্বপ্রথম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে দ্বন্ধ ও কলহের সূত্রপাত ঘটে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে না বাংলা হবে এ নিয়ে চরম মতবাদ দেখা দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। কিন্তু বাঙালী ধর্ম নিরপেক্ষ ও শিক্ষিত সমাজ বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল ভাবে অনুরক্ত ছিল এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানান। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগন তাদের প্রানপ্রিয় মাতৃভাষা বাংলার জন্য প্রাণ দিতেও পিছপা হয়নি। যার উজ্জল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দু অংশের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ছিল নিতান্ত কম। শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক অর্থ ব্যয় করা হত। তুলনামূলক ভাবে পূর্ব পাকিস্তানে এসব খাতে অর্থ ব্যয় হত নিতান্ত নগন্য। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এসব হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিবার জন্য তদুপরি তাদের নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানী জনগন শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে যারই ফলাফল আজকের বাংলাদেশ।

অর্থনৈতিক কারন ঃ-

মূলতঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই ছিল দ্বন্ধ ও কলহের অন্যতম কারন। অর্থনৈতিক দিক দিয়েই পূর্ব পাকিস্তানী জনগন সবচেয়ে বেশী শোষিত ও নির্যাতিত হয়েছিল। পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী এ বৈষম্যের কথা মুখে স্বীকার করে নিলেও কার্যত তা দূরীকরনের কোন প্রচেষ্টাই তারা গ্রহন করেনি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারই ছিল এ বৈষম্যের মূল কারন। এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮-৬৯ সালের মধ্যে মোট ৪১৯ কোটি টাকার সম্পদ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হয়। তাছাড়া ব্যাংক ও বীমা শিল্পের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগের মালিকানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। জাতীয় শিল্প সম্পদের ৬০ ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের আওতাধীন। ব্যবসা বানিজ্যের যাবতীয় লাইসেন্স, পারমিট এবং বৈদেশিক আমদানীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীরাই ভোগ করত। শুধু তা নহেই বিদেশী সকল আমদানীকৃত দ্রব্য প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী করা হত এবং পরবর্তীতে তা আবার পূর্ব পাকিস্তানে রপ্তানী করা হতো। এতে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী শ্রেণী অতিরিক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফা লাভ করত। অথচ দুঃখের বিষয় এ যে, পূর্ব পাকিস্তান হতেই পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আয় হতো। এবং তার শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হতো। এসব সীমাহীন বৈষম্যের ফলে উভয় অংশে চরম দ্বন্দ্ব ও কলহ দেখা দেয়। যা পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে আত্মপ্রকাশ হয় এবং পরিশেষে বাংলাদেশের জন্ম ঘটে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১। মোঃ মোজাম্মেল হক - শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, প্রকাশক ঃ হাসান বুক হাউস, ৬৫ প্যারীদাস রোড বাংলাবাজার, *p.*-১৯১

২। *Morning News*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৭০

৩। আবুল ফজল হক - বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি ঃ প্রকাশক টাউন স্টোর্স, স্টেশন রোড রংপুর, *p.p.*- ৯২-৯৩

৪। আজাদ, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৭০ দৈনিক পাকিস্তান, ২রা নভেম্বর ১৯৭০

৫। দৈনিক পাকিস্তান, ৬ই নভেম্বর ১৯৭০

৬। আবুল ফজল হক ঃ *Ibid p.p*- ৯৩-৯৪

৭। সিরাজুর রহমান - সত্তরের নির্বাচন ও ষড়যন্ত্রের আলোচনা - দৈনিক ইনকিলাব, ৬- নভেম্বর ২০০০

৮। মোঃ মোজাম্মেল হক - বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি *Ibid p.p*-১৯৩-১৯৪

৯। সিরাজুর রহমান - *Ibid*

১০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বজ্রকণ্ঠ (১৯৭২) *p.p.*-৩-৬

১১। মোঃ মোজাম্মেল হক *Opcit p.p.*-২০৩-২০৪

১২। মাহমুদ শফিক - বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, *p.*- ৪৩

১৩। হারুন-অর-রশিদ ঃ বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০ প্রকাশক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারীদাস রোড- *p.p.* - ২৯৩-২৯৪

১৪। মাহমুদ শফিক : *Ibid p.* - ২৭

১৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল দ্বিতীয় খন্ড *p.* ৬০৮

Dhaka University Institutional Repository

১৬। পাকিস্তান টাইমস - ৩১ জানুয়ারী, ১৯৭১

১৭। মোঃ মোজাম্মেল হক ঃ *Opcit p.p.* ২১৪-২১৭

১৮। মোঃ আবদুল ওদুদ ভুঁইয়া - দক্ষিন ও দক্ষিন পূর্ব এশিয়া ঃ সমাজ ও রাজনীতি - প্রকাশনায় রয়েল লাইব্রেরী বাংলা বাজার *p.p.* - ৪০-৪২ং

400427

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত পর্যালোচনায় দেখা যায় বিশ্বের ইতিহাসে প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস বিপ্লবের ইতিহাস, আর এ বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে জানমালের ক্ষতি হয় অবর্ননীয়। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসে ৩০ লক্ষ বাঙালী নর নারীকে জীবন দিতে হয়েছিল। তাই বাঙালী জাতির ইতিহাস রক্তরাঙা ইতিহাস। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শুরু হয় শোষণ ও নির্যাতন। উভয় অংশের মধ্যে প্রথম মত বিরোধ দেখা দেয় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন। মূলতঃ ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্ন নিয়ে বাঙালী জাতি সর্বপ্রথম পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক রক্ত ঝরা সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ধাপে প্রেরণা যুগিয়েছে ভাষা আন্দোলনের রক্তমাখা ইতিহাস। ভাষা আন্দোলনের জাগরনের মধ্যে দিয়ে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন সংঘটিত হয়। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী বাঙালী জাতিকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছিল দীর্ঘ ২৪ বছর। এ সময় তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে বাঙালী জাতিকে খাটো করে রেখেছিল। তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাঙালী জাতিকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক বছর তাদেরকে বিভিন্ন বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছিল। মূলতঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন রূপে শুরু হলেও এরই হাত ধরে বাঙালী জাতি ধাপে ধাপে সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। পরিশেষে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। লক্ষ প্রানের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাঙালীর স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। তবে একথা বলতে দ্বিধা নাই যে, ১৯৭১ সালে অগনিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে ভাষা আন্দোলন ছিল অপরিসীম সাহস ও প্রেরণার উৎস। এ আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ প্রদর্শক। ভাষা আন্দোলনের চেতনাই বাঙালীকে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে এবং এর মাধ্যমেই বাঙালী আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবতীর্ন হয়। একুশের প্রেরণা থেকেই ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান ঘটে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার বাঙালীর সংগ্রামী চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে বাঙালী জাতি নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যার ফলে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এ জাতীয়তাবোধ ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের অন্যতম সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইউনিস্কোর ৩০তম সাধারণ সভায়, ১৮৮টি সদস্য দেশের সম্মতিক্রমে, আমাদের মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেস্কোর এ সিদ্ধান্তের ফলে ২০০০ সাল থেকে অমর একুশে প্রতি বছর ১৮৮ দেশে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে পালিত হবে। বাঙালীর এক বড় অর্জন হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারীর এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। সম্ভবত বাঙালীরাই পৃথিবীতে একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য প্রান বিসর্জন দিয়েছে। তাদের আত্মদান আজ আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বিশ্বের সকল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার অধিকারের স্বীকৃতি এটি। এ স্বীকৃতি থেকে প্রেরণা লাভ করে বাঙালী জাতি পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামে নিজেদেরকে সাহসিকতার সাথে উৎসর্গ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। মাতৃভাষার উন্নয়ন ছাড়া কোন জাতি আজ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এর অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা জানার দরকারই নেই। পৃথিবীর সভ্যতা ওসংস্কৃতিকে জানার জন্য অবশ্যই আন্ত র্জাতিকভাবে স্বীকৃত কয়েকটি ভাষা আয়ত্ব লাভ করা প্রয়োজন। সাথে সাথে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে জানতে হলে মাতৃভাষাই একমাত্র মাধ্যম এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষার উন্নয়নের জন্য বাংলা একাডেমী, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, শিল্পকলা একাডেমী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোর আরো সার্বিক উন্নতি সাধন করা দরকার। বর্তমানে মাতৃভাষার উন্নয়নকল্পে এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো যে সমস্ত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এগুলোর সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সাথে বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

(ক) বই ঃ

কামাল, মোস্তফা - ভাষা আন্দোলন ঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন, ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ১৯৯৩

কাশেম, আবুল - ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা ঃ বলিয়াদি প্রেস, ১৯৪৭

ছফা, আহমেদ - জাগ্রত বাংলাদেশ, মুজিবনগর, ঢাকা ঃ মুক্তধারা, ১৩৭৮

ওমর, বদরুদ্দীন - ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ ঃ কতিপয় দলিল (প্রথম খন্ড), ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪

" " " - পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খন্ড), ঢাকা ঃ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫

" " " - জাতি সমস্যা ও ভাষা আন্দোলন, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ মুক্তধারা, ১৯৭৫

" " " - বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী, ঢাকা ঃ প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ১৯৭৯

" " " - ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ, কতিপয় দলিল (দ্বিতীয় খন্ড), ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

" " " - আমাদের ভাষার লড়াই, ঢাকা ঃ শিশু সাহিত্য বিতান, ১৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

Jinnah, M. A. - *Some Speeches as Governor. General of Pakistan,* Karachi : Pakistan Publication, 1989

মান্নান, মোঃ আবদুল - তুলনামূলক রাজনীতি ও রাজনীতি বিশ্লেষন পদ্ধতি, ঢাকা ঃ করতোয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬

হক, আবুল ফজল - বাংলাদেশ শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর ঃ টাউন স্টোর্স, স্টেশন রোড, ১৯৯৮

" " " - বাংলাদেশের রাজনীতি, রংপুর ঃ টাউন স্টোর্স, স্টেশন রোড, ১৯৯৪

আহমেদ, আবুল মনসুর - আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বৎসর, ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৭০

Maniruzzaman, Talukder - *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath,* Dhaka : Bangladesh Books International Ltd, 1980

" " " - *The Politics of Development : The case of pakistan 1947-1958,* Dhaka : Green Book House Ltd, 1980

" " " - *Military with drawal from politics,* Dhaka : University Press Ltd, 1988

Dhaka University Institutional Repository

Jahan, Rounaq - *Pakistan : Failure in National Integration,* Dhaka : Oxford University press Ltd, 1971

" " " - *India, Pakistan and Bangladesh in G Henderson, Richard N Lebow and John G. stoessinger (eds) Divided Nations in a Divided world,* New york : David Mckay Company, Inc. 1974.

" " " (ed) - *Bangladesh Politics: Problems and Issues,* Dhaka : University Press Ltd, 1980

হক, মোঃ মোজাম্মেল - বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ঃ তৃতীয় সংস্করন, ঢাকা ঃ হাসান বুক হাউস, ১৯৯৭

রশিদ, হারুন-অর - বাংলাদেশ - রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ১৭৫৭-২০০০, ঢাকা ঃ নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০১

উজ্জামান, হাসান - বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম , ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৯২

" " " - বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জামান, হাসান - আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী ১৯৮৪

উল্ল্যাহ, মাহফুজ - অভ্যুত্থানের উনসত্তর, ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩

শফিক, মাহমুদ - বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়, ঢাকা ঃ বর্ণবীনা প্রকাশনী, ১৯৯৩

Islam, M. Nazrul - *Pakistan and Malaysia : A comparative study in National Integration,* New Delhi : Sterling Publishers Ltd, 1989

" " " - *Bangladesh, in G.C. gohari (ed), Government and politics of South Asia,* New Delhi : Sterling Publishers Ltd, 1990

" " " - *Problems of Nation - Building in Developing countries : The case of Malaysia,* Dhaka : Dhaka University, 1988

Uddin , Sharif (ed.) - *Dhaka : Past, Present, future,* Dhaka : Asiatic Society, 1991.

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ - দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজ ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৯৬

হক, আবদুল - ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, ঢাকা ঃ মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

" " - ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস কতিপয় দলিল, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

" " - বায়ান্নর একুশ, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

হেলাল, আল বশীর - ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬

ইসলাম, রফিকুল - ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার, ঢাকা ঃ আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৮২

মুসা, মনসুর (সম্পাদিত) - বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪

কাশেম, এম. এ (প্রকাশিত) - পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা-না উর্দু?, ঢাকা ঃ বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৪৭

আহাম্মদ, মওদুদ - শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৩

" " " - বাংলাদেশ স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা, ঢাকা ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯২

মোল্লা, গিয়াস উদ্দিন - দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

আহমদ, সালাহ্ উদ্দিন - বাংলাদেশ, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯১

এ মুহিত, এ, এম - বাংলাদেশ ইমার্জেন্স অফ এ নেশন, ঢাকাঃ বাংলাদেশ বুকস্ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, সাঈদ-উর - পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকা ঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৩

ইসলাম, সিরাজুল - বাংলার ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী ১৯৮৯

হোসাইন, সৈয়দ সাজ্জাদ - তাঁর বই *The Wastes of Time*-এ জানতে চেয়েছেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করাই যদি তাদের উদ্দেশ্য না হবে তবে ১৯৪৭-এর ১লা সেপ্টেম্বরেই তারা কেন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করে দেবে, যখন পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখাই ছিল মানুষের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

আহমেদ, কামরুদ্দীন - বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা ঃ ডাইজেস্ট, ১৯৭৯

" " " - *A Social history of east pakistan,* ঢাকা ঃ ক্রিসেন্ট বুক স্টোর, ১৯৬৭

Hafiz M. Abdul andKhan Abdur Rab (ed) - *Nation Building in Bangladesh retrospect and prospect,* Dhaka : BIISS, 1986

Rajjak, Abdur - *Bangladesh State of the Nation,* Dhaka : University of Dhaka Bangladesh, 1981

Pandey, B.N. - *South and South East Asia 1945-1979 : Problems and politics,* London : The Macmillan Press, Ltd, 1980

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, আবদুল গাফফার - আমরা বাংলাদেশী না বাঙালী?, ঢাকা ঃ অক্ষর বৃত্ত প্রকাশনী, ১৯৯৩

Weiner, Myron - *Political Integration and political Development, the Annals of the American Academy of political and Social Science,* Vol 358. (March 1965).

Pye, Lucian W. - *Aspects of political Develop ment,* Boston : little, Brown and Company (Inc) 1966.

Rustow, D.A. - *A world of Nations : Problems of political Modernization,* Washington : The Brookings institution, 1967. *and Myron Weiner (ed), Modernization : the Dynamics of Growth,* New york : Basic Books Inc, Publishers, 1966.

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত) - একুশে ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ঃ গ্রন্থনা, ১৯৬৭

Hasim, Abul - *In Retrospection,* Dhaka : Moula Brothers, 1974

দে, আমলেন্দু - পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, কলিকাতা ঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৯

খান, লিয়াকত আলী - পাকিস্তান দি হার্ট অফ এশিয়া, ক্যাম্ব্রিজ ঃ হারভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫০

Dhaka University Institutional Repository

মুসা, আহমেদ - ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, ঢাকা ঃ দীপ্র প্রকাশনী ১৯৯১

ফজল, আবুল - একুশ মানে মাথা নত না করা, ঢাকা ঃ জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৭৮

হক, আবুল কাশেম ফজলুল - একুশে ফেব্রুয়ারী আন্দোলন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ঃ পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১৯৭৬

Shadeq, A. - *The Economic Emergence of Pakistan, Part One,* Dhaka : East Bengal Government, 1954

Ahmed, Emajuddin - *Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth : Bangladesh and Pakistan,* Dhaka : University Press ltd, 1980

Dalton, Dennis and wilson, A.J. - *The states of south Asia : Problems of National Integration,* New Delhi : Vikas Publishing House (pvt.) ltd. 1982

Sayeed, Khalid Bin, - *Politics in pakistan : The nature and Direction of change,* Newyork : Praeger Publishers, 1980

" " " - *Pakistan: The Formative Pase,* Karachi : Pakistan Publishing House, 1960

Dhaka University Institutional Repository

" " " - *The political system of pakistan,* Boston : Houghton Mifflin, 1967

Khan, Zillur R, - *Martial Law to Martial Law : Leadership Crisis in Bangladesh,* Dhaka : University Press Ltd, 1984

Jeffrey, Robin (ed.) - *Asia - the Winning of Independence,* London : The MacMillan Press ltd, 1981

Sar Desai, D.R. - *South - East Asia : Past and present,* New Delhi : Vikas Publishing House (pvt.) Ltd. 1981

হোসেন, সিরাজুদ্দিন - ইতিহাস কথা কও, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ

রহমান, সিরাজুর - "সত্তরের নির্বাচন ও ষড়যন্ত্রের আলোচনা", ঢাকা ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ২০০০

শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ - "আমাদের ভাষা সমস্যা" ঢাকা ঃ দৈনিক আজাদ, ১২ শ্রাবন, ১৩৫৪।

আহমদ, কামরুদ্দিন (প্রকাশিত) - "আশু দাবি কর্মসূচী আদর্শ", কনভেনার গণআজাদী, করাচী ঃ পাকিস্তান পাবলিশিং হাউস ১৯৪৭

সামসুল হক কর্তৃক (প্রকাশিত) - "আমরা গড়িব সুখী গণতান্ত্রিক পাকিস্তান", ঢাকা ঃ পূর্ব-পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনের পক্ষ হতে প্রকাশিত বলিয়াদি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৪৭

" " " - "কন্সটিটুয়েন্ট এ্যাসেমব্লী অফ পাকিস্তান ডিবেটস", করাচি ঃ গভর্ণমেন্ট অফ পাকিস্তান প্রেস, ১৯৪৮

শিশির গুপ্ত সেমিনার - দিল্লী, জুন, ১৯৯৭ইং

বজ্রকণ্ঠ থেকে (প্রকাশিত) - "গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" একুশে সংকলন, ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮০

রহমান, হাবীবুর - "একুশের সংকলন", ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮০

হক, গাজিউল - "একুশের সংকলন", ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮০

চৌধুরী, আবদুর রহমান - "প্রথম সভা ও মিছিল", ঢাকা ঃ দৈনিক

কাশেম, আবুল বাংলা, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, শেখ নুরুল - তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলন ঃ বর্তমান তৎপরতা ও তার নেপথ্য কাহিনী, ঢাকা ঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৯৯৩

কাদের, আহমদ আবদুল - "আমাদের জাতিসত্ত্বার স্বরূপ অন্বেষণ", ঢাকা ঃ মাহবুবুর রহমান সম্পাদিত মানব উন্নয়ন জার্নাল, ১৯৮৯

Binder, Leonard - "National Integration and Political Development" *American Political Science Review,* Vol, LVIII, No. 3 (September 1964)

ভাষানী, মাওলানা স্বাক্ষরিত প্রচারপত্র - "পূর্ব-পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন", ঢাকা ঃ ১৯৭১

উজ্জামান, আনিস - "বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ", কলকাতা ঃ প্রকাশনায় চতুরঙ্গ, ১৯৮৫

" " " - "দোদুল্যমান জাতীয়তা", ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

ইসলাম, মোস্তফা নুরুল (সম্পাদিত) - "মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান", ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭

সিরাজী, এ,এম, ইসমাইল হোসেন - "মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি", ঢাকা ঃ ইসলাম প্রচারক, ১৯০২

আলী, সৈয়দ এমদাদ - "বঙ্গভাষা ও মুসলমান", ঢাকা ঃ বঙ্গীয় মুসলমান, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৫

বঙ্গবাসী, খাদেমুল এসলাম - "বাঙালীর মাতৃভাষা", ঢাকা ঃ আল এসলাম, ১৩২২

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য বিশারদ, আবদুল করিম - "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান", ঢাকা ঃ আল এসলাম, ১৩২৫

করিম, সরদার ফজলুল - "জাতীয়তাবাদের ভূমিকা", বাংলাদেশ, ঢাকা ঃ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তর, ১৯৭২

রফিক, আহমদ - "ভাষা আন্দোলন ঃ জাতীয়তার চালচিত্র"। নিবন্ধটি ৫টি গণ আন্দোলন নামে একটি সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক, খায়রুল আনোয়ার, আবদাল আহমদ ও রেজোয়ানুল হক রাজা, ঢাকা ঃ ১৯৯১

রহমান, শেখ মুজিবর - "আমাদের বাঁচার দাবী ঃ ছয়দফা কর্মসূচি", ঢাকা ঃ সাধারণ সম্পাদক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৬৬

রমযান, সাইদ-উর - "আইয়ুব খানের আমলে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রশাসনিক বিতর্ক", ঢাকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ১৯৭৪

আহমেদ, কামাল উদ্দিন - "চুয়ান্ন সালের নির্বাচন ঃ স্বায়ত্বশাসন প্রসঙ্গে", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা-১৯৯৩।

উমর, বদরুদ্দীন - "ভাষা আন্দোলন", সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩ইং

রশিদ, হারুন-অর - "অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ", সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত ১ম খন্ড, ঢাকা, ১৯৯৩ইং

" " " - "ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স এবং বাংলাদেশের সংবিধান" এমাজ উদ্দিন আহমদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তা ভাবনা, ঢাকা, ১৯৯২ইং

Dhaka University Institutional Repository

Huq, Abul Fazl - "Constitution - Making in Bangladesh" *Pacific Affairs vd 46, No. 1,* Canada : University of British Columbia, 1973

চৌধুরী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী - "বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য" কোহিনুর, ১৩২২

সোবহান, রেহমান - "ইস্ট পাকিস্তান ডিমান্স হার ভিউ" লন্ডন ঃ দি টাইমস্, ১৯৬৩

" " " - "দি চ্যালেঞ্জ অফ ইন ইকুয়েলিটি" ঢাকা ঃ দি পাকিস্তান অবজারভার, ১৯৬৫

সামাদ, আতাউস - "দুই দশকের রাজনীতি" *Bangladesh : Past Two Decades and the Current Decade* (Kazi Khaliquzzaman, ed) Dhaka, 1994.

রাজ্জাক, আবদুর - "বাংলাদেশ ঃ জাতির অবস্থা", ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ১৯৮৭

আজাদ, ইবনে - "বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত", ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিডিটেড, ১৯৮৭

খান, এনায়েতুল্লাহ - "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ", ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

আহাম্মদ, এমাজউদ্দিন - "বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ঃ কটি প্রশ্ন" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, জাতীয়তাবাদ বিতর্ক।

রহমান, আসহাবুর - "বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমস্যা", ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা ঃ

আনন্দবাজার পত্রিকা - ২৬-০২-১৯৪৮ইং

" " " - (শেষ শহর সংস্করন) ২৭-২-১৯৪৮ইং

Morning News - ০৭-১২-১৯৪৭ইং

" " " - ২৮-০১-১৯৫২ইং

" " " - ৩১-০১-১৯৫২ইং

" " " - ২৬-১০-১৯৭০ইং

অমৃতা বাজার পত্রিকা - (শহর সংস্করণ) ২৭-০২-১৯৪৮ইং

" " " - ১২-০৩-১৯৪৮ইং

" " " - ১৩-০৩-১৯৪৮ইং

" " " - ১৪-০৩-১৯৪৮ইং

" " " - *"East Bengal Assembly proceedings" Vol. 1*

" " " - ১৬-০৩-১৯৪৮ইং

নও বেলাল - ০৪-০৩-১৯৪৮ইং

" " " - ১৯-০৩-১৯৪৮ইং

" " " - ২২-০৪-১৯৪৮ইং

" " " - ২৬-০৪-১৯৪৮ইং

" " " - ৩১-০১-১৯৫২ইং

" " " - ১৪-০২-১৯৫২ইং

Dhaka University Institutional Repository

" " " - ২২-০৩-১৯৫২ইং

" " " - ২৭-০৩-১৯৫২ইং

দৈনিক যুগান্তর - ০২-০৪-১৯৪৮ইং

দৈনিক আজাদ - ২৭-০৭-১৯৪৭ইং

" " " - ০৭-১২-১৯৪৭ইং

" " " - ১৫-১২-১৯৪৭ইং

" " " - ২৮-০১-১৯৪৮ইং

" " " - ০২-০৪-১৯৪৮ইং

" " " - ১০-০৪-১৯৪৮ইং

" " " - ১৫-০৭-১৯৪৮ইং

" " " - ০১-০২-১৯৫২ইং

" " " - ২৩-০২-১৯৫২ইং

" " " - ২৪-০২-১৯৫২ইং

" " " - ২৫-০২-১৯৫২ইং

" " " - ১৯-০১-১৯৭০ইং

" " " - ০২-১১-১৯৭০ইং

" " " - ০৬-১১-১৯৭০ইং

The Bangladesh Observer - ২৯-১১-১৯৮১ইং

Holiday - ১৮-১০-১৯৮১ইং

Sunday Times (London) - ৩০-০৫-১৯৭৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক	-	১০-০২-১৯৫২ইং
" " "	-	১৭-০৩-১৯৫২ইং
" " "	-	২৭-০২-১৯৫২ইং
" " "	-	১৪-০৩-১৯৬৯ইং
The Statesman	-	৩০-০১-১৯৫২ইং
" " "	-	২৮-০২-১৯৫২ইং
" " "	-	৩০-০৪-১৯৫২ইং
পাকিস্তান টাইমস	-	৩১-০১-১৯৭১ইং
দৈনিক পাকিস্তান	-	১৭-০৩-১৯৭১ইং
খবরের কাগজ	-	১১-০৭-১৯৯১ইং
সংবাদ	-	১৬-০২-১৯৯৬ইং
সৈনিক	-	৩১-০৩-১৯৫৩ইং
বজ্রকণ্ঠ	-	১৯৭২ইং
দৈনিক ইনকিলাব	-	০৬-১১-২০০০ইং
ঢাকা ডাইজেস্ট	-	মার্চ ১৯৭৮ইং
" " "	-	নভেম্বর ১৯৭৮ইং
" " "	-	জুন ১৯৭৯ইং